শরণার্থীর দিনলিপি

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী

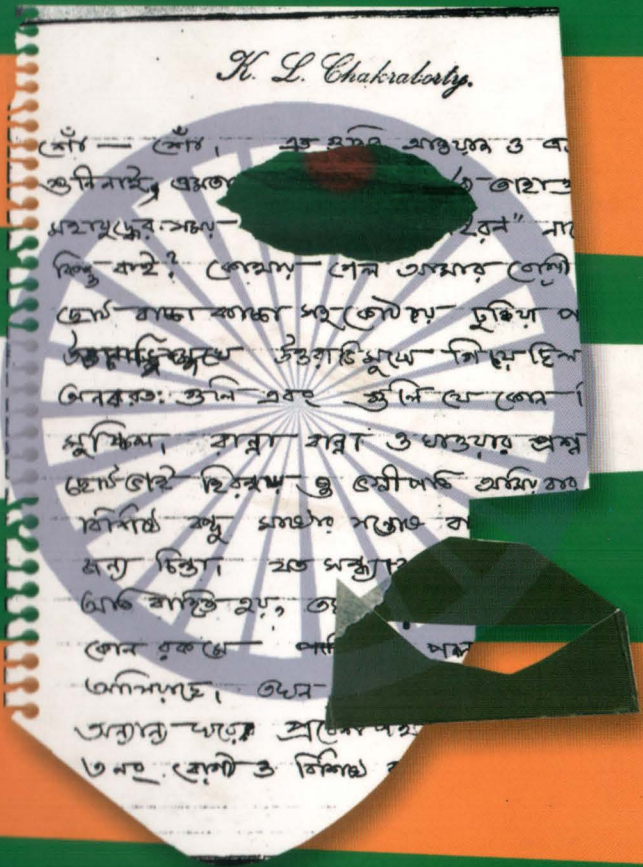

শরণার্থীর দিনলিপি

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী

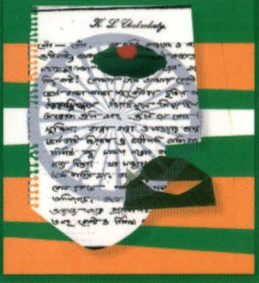

পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে নিজ বাসভবনে সুখী, সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবারেরই একজন ছিলাম। হঠাৎ বাঙালীর ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার পর, অর্থাৎ গত ২৬/০৩/১৯৭১ ইং (২৬শে মার্চ) শুক্রবার হইতে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়, তার এক কণাই আমি সত্য ঘটনা হিসাবে আমার মনে থাকার জন্য লিখিবার চেষ্টা করিলাম। আমি কবি, লিখক বা দার্শনিক নই। তাই শ্রুতিমাধুর্য্য, ভাষার মিল কিছুই আমার লেখায় নাই। আমি শুধু সত্য ও করুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি মাত্র।

প্রচ্ছদ :: সৈয়দ ইকবাল
www.syediqbal.com

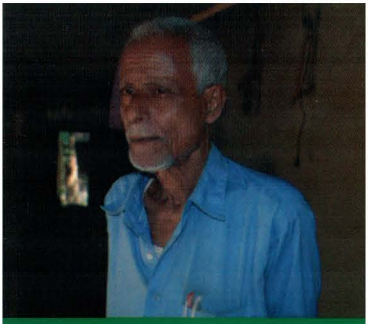

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী (জন্ম ১৯৪২ সালে, চট্টগ্রামে)। প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি নিজ গ্রাম কুমিরায় হোমিও চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে প্রাণরক্ষার্থে তিনি ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আগস্ট মাসে একটি দিনলিপি লিখতে শুরু করেন যার নাম দিয়েছি আমরা 'শরণার্থীর দিনলিপি'। এক সময় যাত্রার সমজদার দর্শক ছিলেন, যাত্রাভিনয় ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের নেশা। ১৯৭৭ সালে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তি তিন দশকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকা রচনার কাজে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেন। তিনি ইতিমধ্যে ১৩৮২ জন জাতকের জন্মপত্রিকা রচনা করেছেন। শ্রী চক্রবর্ত্তী সব সময় কোনও না কোন কাজে ব্যস্ত, তাঁর এক মুহূর্ত অবসর নেই।

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

১৯৭১
শরণার্থীর দিনলিপি

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

শরণার্থীর দিনলিপি

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
প্রকাশক: জামাল উদ্দিন আহমেদ
দি রয়েল পাবলিশার্স
৩৬ বাংলা বাজার, দোতলা, ঢাকা-১১০০।
ফোন: ৭১১৬৩৯১, ০১৭১৫-০৯৩৪১১
e-mail: royal_publishers@yahoo.com
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রচ্ছদ: সৈয়দ ইকবাল
মুদ্রণ-পরিকল্পনা ও
সার্বিক তত্ত্বাবধান: শিশির ভট্টাচার্য্য
বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ: ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১১০০
পরিবেশক: এ্যাবাকাস পাবলিকেশন্স
কম্পিউটার মার্কেট (নিচ তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
আমেরিকা পরিবেশক: Muktadhara
Jackson Heights, NY, USA
কানাডা পরিবেশক: The Bengali times,
272209 Crescent Town Palace, Toronto, Ontario, M4C 5LB, Canada

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা মাত্র

SHORONARTHIR DINOLIPI by Kanai Lal Chakraborty, Published by Jamal Uddin Ahmed, The Royal Publishers, 36 Banglabazar, Dhaka 1100, © Author, First published: February, 2013. Price Tk. 150, US $: 10.00.

ISBN 984-70254-0195-1

মাতৃদেবী ৺চারুবালা চক্রবর্ত্তীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

-: লিখকের মন্তব্য :-

K. L. Chakraborty.

করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে নিজ বাসস্থানে (বাংলাদেশে) সুখী, সুস্থ ও সুস্থ চরিত্রেরই একজন হিসাবে, হঠাৎ বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দেখছে হওয়াতে এবং প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার পর অর্থাৎ গত ১৮/৩/৭১ইং (১৮ শে মার্চ) শুক্রবার হইতে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়, তার এক কাহিনী আমি সত্য ঘটনা হিসাবে মাত্র মাকের জন্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি কবি, লিখক এবং দার্শনিক নই। তাই অলঙ্কার, বেশবিন্যাস কিছু নাই। শুধু সত্য ও কারণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি মাত্র।

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার,
ডাকঘরঃ- কুমিরা,
জিলাঃ- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ইতি
লিখকঃ- (স্বাক্ষর)
২/৮/৭২ইং, ১৬ই শ্রাবণ ৭৮বাং
সোমবার।

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার,
ডাকঘরঃ- কুমিরা,
জিলাঃ- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সম্পাদকের কথা

আফগানিস্থান-ইরান সীমান্তে অবস্থিত উত্তর ভারত ও চীন সীমান্তে অবস্থিত পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একটি অদৃশ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে বলে আমার ধারণা। উত্তর ভারত আধিপত্যবাদী, পূর্ব ভারত স্বাতন্ত্র্যবাদী। মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রতিনায়ক শিশুপাল-জরাসন্ধ-পৌণ্ড্র বাসুদেব গং এর শত্রুতারও বহু পূর্বে সম্ভবত এই দ্বন্দ্বের শুরু। পাকিস্তান আন্দোলন এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ এই অর্থে যে ১৯০৫ সালে পূর্ব ভারতের বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনে 'পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু উত্তর ভারতের নেতাদের কূটকৌশলে তাদের সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। প্রায় আড়াই দশক ধরে 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রযন্ত্রটিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর দমন-পীড়ন চালিয়েছিল উত্তর ভারতের পাঞ্জাবি মুসলমানেরা। অবশেষে শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী পূর্বভারতে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের যে কোন জাতির তুলনায় বাঙালিরা রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সফল এই অর্থে যে আর কোন জাতি এককভাবে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়নি।

কোন বিজয়, কোন পরিবর্তন বিনামূল্যে আসে না। আগেকার দিনে রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হতো তখনও যেমন উলুখাগড়াদের প্রাণ যেতো, আজকের অ-রাজক পৃথিবীতেও যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও দাঙ্গার

বেশির ভাগ ধকল উলুখাগড়াদেরই পোহাতে হয়, সে বাংলাদেশেই (১৯৪৭ বা ১৯৭১) হোক, ইরাকেই হোক বা ভিয়েতনামেই হোক। তারা অবশ্য সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয় না, কিন্তু অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে তারা, তাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়, চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রিয় সন্তানেরা, সম্ভ্রম হারায় তাদের মা-বোন-বনিতা। বুদ্ধিজীবী শহীদগণের তালিকা, সেনাপতিদের স্মৃতিকথা, ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে যে ধারণা সাধারণত করা হয়ে থাকে তা হিমশৈলের অতি ক্ষুদ্র উপরিভাগ মাত্র।

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার কুমিরা গ্রামের সাধারণ একজন অধিবাসী। পেশায় তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, নেশায় যাত্রাভিনেতা, যাত্রার সমজদার। ১৯৭১ সালে রিক্তহস্তে, এক কাপড়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়ে তিনি অবর্ণনীয় শারিরীক ও মানসিক কষ্টভোগ করেন, তাঁহার দুই দু'টি সন্তান তাঁরই চোখের সামনে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সম্ভবত শোক অপনোদনের জন্যেই তিনি স্মৃতি থেকে মাত্র কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া কাহিনী লিখতে শুরু করেন ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে এবং ডিসেম্বর মাসে এই দিনলিপির একটি অনুলিপি তৈরি করেন। ভারতে শরণার্থী জীবনে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মানবিক বিপর্যয়, নিজের কষ্ট আর পুত্রশোকের কথা সবিস্তারে বণনা করেছেন তিনি তাঁর দিনলিপিতে।

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী মুক্তিযোদ্ধা নন, রাজনীতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ কোন কালে ছিল না। নিজেকে তিনি একজন ভয়কাতর, আরামপ্রিয় লোক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, বাঙ্গালি ও পাঞ্জাবি সৈন্যেরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে পুরাণকাহিনীর রাম ও রাবণের মতো পরস্পরের প্রতি তীরের পরিবর্তে মেশিনগান বা বন্দুকের গুলি নিঃক্ষেপ করবে এবং তিনি তাঁর দোতলা কোঠাঘরের (মাটির বাড়ির) বারান্দায় দাঁড়িয়ে বন্ধুবান্ধব সমাভিব্যাহারে সেই যুদ্ধ উপভোগ করবেন! অল্পক্ষণ পরেই অবশ্য মেশিনগান ও মর্টারের ভয়ঙ্কর শব্দে যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করে তিনি জ্ঞান

হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল কুমিরায়, ২৬শে মার্চ তারিখ, শুক্রবার সন্ধ্যায়। সেই যুদ্ধের বর্ণনা শ্রী চক্রবর্ত্তীর ভাষায়:

> "হঠাৎ বিকট শব্দ ট্র-ট্র-ট্র-

পরের দিন তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। সেই দিনই বিকালে পিতৃ পুরুষের ভদ্রাসন পুড়ে ছাই হবার খবর যখন তিনি পেলেন, তখন তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন অন্য কোন কিছুর জন্যে নয়, তাঁর ডাক্তারী সার্টিফিকেট, ভাই হিরণ্ময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. (বাংলা) সার্টিফিকেট আর তাঁর যাত্রাগানের বইয়ের সংগ্রহের জন্য। এই সব যাত্রানাটক তিনি বহু বৎসর ধরে, বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজ হাতে বহু রাত জেগে প্রতিটি বইয়ের নকল করেছিলেন।

'উৎসবে ব্যাসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ পশ্যতি সঃ বান্ধবঃ'

শ্রী চক্রবর্তীর লেখায় আমরা দেখি, মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে বন্ধু, সহপাঠী ও প্রতিবেশীরা ১৯৭১ এর রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যখন নিজের প্রাণ ও পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার্থে ঘর ছেড়ে পথে নামলেন, তখন মুসলমান বন্ধুরা তাঁকে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়াছেন, আশ্রয় দেবারও প্রস্তাব করেছেন। দীর্ঘ আট মাস পরে দেশ স্বাধীন হলে এই বন্ধুরাই ভারতে তাঁর কাছে অর্থ প্রেরণ করেছেন যত শীঘ্র সম্ভব স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না, কিন্তু হিন্দুদের সর্বতোভাবে রক্ষায়ও যে বহু মুসলমান সদাতৎপর ছিল তার কিছু প্রমাণ 'শরণার্থীর দিনলিপি'-তে আছে।

বিপদে পড়লে বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপরের মতো আচরণ করতে থাকে, হতে পারে নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে, কারণ বিপদ কত দিনে শেষ হবে তাতো মানুষ জানে না। সুতরাং মানুষের চরিত্র বুঝতে হলে কষ্ট বা বিপদের সময় সে কেমন আচরণ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। শরণার্থী জীবনে শত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী চক্রবর্ত্তী চেষ্টা করেছেন নিস্বার্থভাবে অপরের উপকার করতে। দুঃখ তাঁকে অ-মানুষে পরিণত করতে পারেনি। কারও বিরুদ্ধে শ্রী চক্রবর্ত্তীর কোন অভিযোগ ছিল না। চরম পুত্রশোকের মুহূর্তে একটি মাত্র লোককে তিনি একবার মাত্র গালি দিয়েছেন: 'লক্ষ্মীছাড়া ইয়াহিয়া খান!' ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মতো পাষণ্ডদের

পর্বতপ্রমাণ অপরাধের কথা চিন্তা করলে এ গালিকে 'ফুলের টোকা' বলতে হবে।

> "একটু আগে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ বাতাস আছে, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। মধ্য রাত্রে ছেলেকে নিয়ে শ্মশানে যাইতে হইবে। অগ্নিসংযোগ হইবে না, ব্রাহ্মণের কোন চিহ্ন বর্ত্তমানে নাই। শ্মশানেরও দরকার নাই। কারণ এক সাইনবোর্ড আছে, আমরা শরণার্থী। লক্ষ্মীছাড়া 'ইয়াহিয়া খান'!" (হোজাই)

প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধের কারণে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কোনও না কোন জনগোষ্ঠী গৃহহারা হচ্ছে। ধরা যাক, একজন সংবেদনশীল সম্পন্ন গৃহস্থ, মাত্র কয়েকদিন আগেই যার সব ছিল, তিনি সহায়-সম্পদ হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে অকুল পাথারে পড়লে, পেটের দায়ে এর ওর কাছে তাকে হাত পাততে হলে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তার কিছুটা আভাষ এই দিনলিপিতে পাওয়া যাবে।

রিফিউজি-শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া সহজ কাজ নয়। উন্নত দেশগুলো পর্যন্ত কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ অভিবাসীর পুনর্বাসন করতে গিয়ে হিমসিম খায়। মাত্র কয়েক মাস সময়কালে প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া যে কোন দেশের পক্ষেই কঠিন একটি কাজ ছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারত সরকার এই মহাকর্তব্যটি সুচারুরূপে সম্পাদন করেছিলেন। কেমন ছিল শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের দৈনন্দিন জীবন? শরণার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার কাজে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ কতটা সফল হয়েছিল? সরেজমিন অভিজ্ঞতার আলোকে এই সব প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে বর্তমান পুস্তকে।

'শরণার্থীর দিনলিপি' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটা আঞ্চলিক ইতিহাসেরও একটি দলিল, কারণ ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত মোট বাইশ দিনে উত্তর চট্টগ্রামের কুমিরা-মছজিদ্যা-সীতাকুণ্ড-মীরসরাই-বার আউলিয়া অঞ্চলে কি কি ঘটেছিল তার কিছু বর্ণনা এতে পাওয়া

যাবে। শৈলীগত দিক থেকেও এই রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটি কমবেশি সাধু রীতিতে লেখা হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সংস্কারের প্রভাবমুক্ত বানান ব্যবহৃত হয়েছে। রচনাটির বানান, বয়ান (Discourse) ও বাক্যরীতি মূলানুগ রাখা হয়েছে, এমনকি যেখানে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে সেখানেও সম্পাদকের কলমকে যথাসম্ভব সংযত রাখা হয়েছে। সম্পাদকের টীকা [তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে চলিত ভাষায় দেয়া হয়েছে]।

শ্রী চক্রবর্ত্তী বার বার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি 'লিখক' নন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে মানবিক বিপর্যয়, দুঃখ ও শোকের বর্ণনায় তাঁর সংযম ও মুনশিয়ানা প্রশংসা করার মতো। চীনা চিত্রে যেমন তুলির দুই একটি আঁচড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়, তেমনি দুই একটি কথায় ডাক্তারবাবু নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করেন এমন একজন কথক ঠাকুরের মতো যিনি হাসির কথা বলতে গিয়ে নিজে হাসিতে ফেটে পড়েন না, অথবা শোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজে কেঁদে আকুল হন না।

"পথে চৌধুরী বাড়ীর একটা বড় পুটলি কিভাবে যেন খুলিয়া পড়িয়া গেল। দেখি, চৈত্র-সংক্রান্তীর কিছু 'চিড়া-মুড়ি' ও 'লাড়ু-লাবণ'। কুড়াইতে গিয়ে একটা মুখে দিলাম। মেয়ে মিষ্টি কাঁধে ছিল, তাহার কথা স্মরণ নাই। হঠাৎ 'বাবা' শব্দে টনক নড়িল, তাহাকেও এক কামড় দিতে হইল। মেয়ে সেই অংশ খাওয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্তটা শেষ করিয়া দিয়াছি।" (গৃহত্যাগ)

"রাত্রে শুইবার জায়গা নাই। একটি 'কুইজ্যাতলে' শুকনা খড়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মাখন জেঠা উঠিয়া বসিল। দেখিল, একটা বেশ 'দাড়িগোঁফ' ওয়ালা (পাঞ্জাবীর মত) ছাগল তাহার মাথায় প্রস্রাব করিয়াছে ও কিছু ছাগলাদ্য বটিকাও দিয়াছে। উপায় নাই, দুর, দুর করিয়া আবার শুইয়া পড়িল।" (শ্রীনগর)

"রাত এগারটায় চোখ খুলিল ও 'মা' বলিল। মনে শান্তি আসিল। বাঁচিবে না, তবে আজ রাত থাকিতে পারে। রাত ১১/১৫ মিনিটে পুনঃ খিচুনি শুরু হইল। এমতাবস্থায় কোথায় একটু মিছরির জল ও গরম দুধ দিব তা না, ছেলের মুখে টিউব ওয়েলের কাঁচা জল দিতে

লাগিলাম। রাত বারোটায় ছেলে ফাঁকি দিল। তাহার মায়ের অবস্থা লিখিলাম না। দশদিন আগে ছোট ছেলে ও দশদিন পর বড় ছেলে ফাঁকি দিলে মায়ের অবস্থা অনুমেয়।" (হোজাই)

গত দুই দশকে বহুবার আমি এই দিনলিপিটি সম্পাদনা করার কথা ভেবেছি। কমপক্ষে এক দশক পূর্বে দিনলিপিটি মুদ্রণ করতে পারলে ভালো হতো, কারণ দিনলিপির সব কুশীলবেরই বয়স হয়ে গেছে, বেশ কয়েক জন ইতিমধ্যে ধরাধামের মায়াও ত্যাগ করেছেন। যাহোক, রচনার বিয়াল্লিশ বৎসর পর অবশেষে এই কর্তব্যটি পালন করতে পেরে নিজেকে কিছুটা হলেও দায়মুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

আশাকরি 'শরণার্থীর দিনলিপি' পাঠকপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হবে না।

শিশির ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সাল।

চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজে নানা সরঞ্জাম গুলি-গোলা ও গাড়ীগোলা ও
হয়েছে, বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে কার কৌ কিছু নয়, কিন্তু
শেষ রাত্রে ঘুমন্তদের আক্রমণে (নিদ্রিত অবস্থায়) জানিয়ে [illegible] পর
গুলিতেছি, অসম্ভব গোরাগণ, কিন্তু বন্দরে ও উক্ত বন্দরেই অ
(রেজিষ্ট্রি প্রদেশ সারী), বন্ধুদের সঙ্গে বন্দরে, সেনাদল ও প্রহরীর
প্রাত রাখ্ আরিয়া একের এগারো সালেই দেশি অনেক রিভোলবারী ম
ও কিছু সংখ্যক গুলিগোলা ইত্যাদি, বন্দরের রাস্তা ঢাকা [illegible]
লোকে লোকারণ্য, শুধু বন্দাবলি ও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, [illegible]
সকল দখাটার জেনারেল টিক্কা খানের [illegible]
সামরিক শাসনের দ্বারা বৃদ্ধি।

আরও শুনিলাম :— একদল পাঞ্জাবী সরকারী সৈন্য
পাহাড়ের উত্তর দিক হইতে (কুমিল্লার দিক হইতে) চট্টগ্রাম
অভিমুখে রওনা হইয়াছে। তাহাতে আমার বা আমাদের
কি গতি বা অবস্থিতি হইবে তাহা কল্পনার বাহিরে, আ
যুদ্ধের কথা শুনিয়াছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেহা
ছোট ছিলাম তাই সঠিক ভয় জানিতাম না যুদ্ধ দেখার উপ

১৯৭১
শরণার্থীর দিনলিপি

পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে নিজ বাসভবনে (গ্রামঃ কুমিরা, থানাঃ সীতাকুণ্ড, জিলাঃ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) সুখী, সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবারেরই একজন ছিলাম। হঠাৎ বাঙালীর ভাগ্যাকাশ মেঘাচছন্ন হইয়া প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার পর, অর্থাৎ গত ২৬/০৩/১৯৭১ ইং (২৬শে মার্চ) শুক্রবার হইতে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়, তার এক কণাই আমি সত্য ঘটনা হিসাবে আমার মনে থাকার জন্য লিখিবার চেষ্টা করিলাম। আমি কবি, লিখক বা দার্শনিক নই। তাই শ্রুতিমাধুর্য্য, ভাষার মিল কিছুই আমার লেখায় নাই। আমি শুধু সত্য ও করুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি মাত্র। ইতি,

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
২রা আগস্ট, ১৯৭১ ইং;
১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৮ বাংলা
সোমবার

পত্রাংক

ভূমিকা ১৫
এক। যুদ্ধ আরম্ভ ১৭
দুই। চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ ৩১
তিন। গৃহত্যাগ ৩৫
চার। শ্রীনগর ৪৯
পাঁচ। মনুবাজার ৫০
ছয়। আগরতলা ও ধর্মনগর ৫৯
সাত: শিলচর ও লামডিং ৬০
আট। হোজাই ৬৪
নয়। শিবু ৬৬
দশ। পুনর্মিলন ৬৭
এগার। হোমিও সেবাসদন ৬৮
বার। আতস ৭১
তের। তাপস ৭১
চৌদ্দ। প্রত্যাবর্তন ৭৬
পনের। হরিণা ৮১
ষোল: জয় বাংলা ৮২

ভূমিকা

সরল, সহজ ও সুন্দরভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে নিরত থাকিয়া নিজেকে পরম সুখী বলিয়া গর্ববোধ করিতাম। গত ডিসেম্বর, ১৯৭০ইং এর প্রথম ভাগে দেশে (পূর্ব পাকিস্তানে/ বাংলাদেশে) গণভোটের তোড়জোর চলিতেছে। যথারীতি ভোট দিলাম।

ফল প্রকাশ হইল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে জয়ী হইলেন।

তারপর, নানা রাজনৈতিক আলোচনা গুনগুন স্বরে শুনা যায়, কিন্তু কাজের ঝামেলায় ও রাজনীতিতে আগ্রহ নাই বলিয়া সেদিকে আমার মনোযোগ তেমন নাই। সবাই মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গবন্ধু আসনে বসিবেন ও বাঙালীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বর্তমানের চেয়েও সুখতর হইয়া সুখতমে গিয়া পৌঁছাইবে। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য, এমন সুখের জীবন ইতিহাসে কেউ আর কোনদিন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ীঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল। কারও ভাই আছে, মা নাই, আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কেউ পাঞ্জাবীর গুলিতে প্রাণ দিয়াছে, কেউ গুণ্ডার কবলে প্রাণ হারাইয়াছে, কেউ পথে মারা গিয়াছে। বাকী কিছু (প্রায় এক কোটি) নানা সীমান্ত দিয়া রিক্ত হস্তে, ভাঙ্গাবুকে, জীর্ণ শরীর নিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

K. L. Chakrabarty.

হোঁ — হোঁ। এত শুনিয়া আত্মহারা ও বড় অস্থির হয়ে দেখি বা শুনিনাই, ওয়াকেন্দ্রায় কিংবা কেন্দ্র তাহাও মনে নাই। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শুনেছিলাম, "সাইরন" নামে কিসে সংকেত পাওয়া যাইত, কিন্তু কই? কোথায় গেল আমার বেলী পার-কোথায় গেল হাবিবার ছোট বাচ্চা বাচ্চা সব ছোট ছোট ছুটিয়া পড়িলাম, প্রথমে ভাবিলাম উত্তরাভিমুখে গিয়াছিল, কারণ বিমানের মধ্য অবস্থায় শুনি এবং শুনি যে কোন দিক থেকে পড়ে তাহারা মুখিল, রান্না বান্না ও খাওয়ার প্রশ্ন উঠেই না। ছোটভাই হিরণ ও স্ত্রীপুত্র প্রমিলা বধূ, ভাইপো-দুলাল-বৌমা, বিশিষ্ট বন্ধু মাখন সরকার বাবু ও প্রমথের জ্যেষ্ঠ মনোরঞ্জন বাবু সবাইর জন্য চিন্তা। বড় সন্ধ্যার ছায়া পার হয়ে রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়, তখন উক্ত ছোট ভাই ও প্রমিলা বধূ সবাই কোন রকমে পালিয়ে পলাইয়া ও কাঁধার আঁচড় খাইয়া আসিয়াছে। তখন দেখি — আমার পায়ের ঘা, ভাইপো বিশ্বনাথ ও অন্যান্য ঘায়ের প্রকোপ নাই। কারণ পায়ের উক্ত ১নং ও ৩নং বেলী ও বিশিষ্ট বন্ধু বন্ধুর সান, হাঁৎ হোঁ-কাল

এক। যুদ্ধ আরম্ভ

৩রা মার্চ্চ ১৯৭১। হরতাল বা ধর্মঘট

১লা মার্চ, ১৯৭১ইং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে রাহুর দৃষ্টি পড়াতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিল করিয়া দিলেন। পরদিন হইতে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যানবাহন, অফিস-আদালত, কলকারখানা এমন কি আরক্ষা বিভাগও (থানা) বন্ধ হইয়া যায়।

বলাবাহুল্য, কোন লোক হয়ত দূর-দূরান্তে তার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধুবদের বাড়ীতে গিয়াছে, সে সেই খানেই রহিয়া গিয়াছে। এই রূপ দৃষ্টান্ত অনেক। জিনিষপত্রের চড়াদাম ও দোকানপাট প্রায় বন্ধ। এইভাবে ২৫/৩/৭১ ইং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলিল।

২৬শে মার্চ্চ ১৯৭১ইং, শুক্রবার

পূর্বরাত্রে (২৫/৩/৭১) শুনিয়াছিলাম, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজে নাকি সাধারণ গুলি-গোলা ও গন্ডগোল হয়েছে বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে। এর বেশ কিছু নয়। কিন্তু শেষ রাতে ঘুম থেকে আমাকে (লিখক স্বয়ং) জাগিয়ে দেওয়ার পর শুনিতেছি, অসম্ভব সোরগোল। আমার বাড়ীর নিকটে পূর্ব্বদিকে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের উপর বড় কুমিরা বাজার ও উক্ত বাজারেই আমার হোমিও ডিসপেনসারী। বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে গেলাম ও প্রভাতের সামান্য প্রাতরাশ সারিয়া অবসর হওয়ার সাথেই দেখি অনেক মিলেটারী, মানুষজন ও কিছু সংখ্যক গুলিগোলা ইত্যাদি। বাজারের রাস্তা, ঢাকা ট্রাংক রোড লোকে লোকারণ্য, শুধু বলাবলি ও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

সকাল দশটায় জেনারেল টিক্কা খানের ভাষণ এবং সামরিক শাসনের ধারা বৃদ্ধি।

আরও শুনিতেছি: একদল পাঞ্জাবী সরকারী সৈন্য পায়দলে উত্তর দিকে হইতে (কুমিল্লার দিক হইতে) চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হইয়াছে। তাহাতে আমার বা আমাদের কি ক্ষতি বা অসুবিধা হইতে পারে তাহা

কল্পনার বাহিরে, কারণ যুদ্ধের কথা শুধু কানে শুনিয়াছিলাম, কখনও দেখি নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেহাত ছোট ছিলাম। তাই অন্তরে ভয় থাকিলেও যুদ্ধ দেখার উৎসাহ আমার মত বোকাটে লোকের কম নয়। এইভাবে দৌড়াদৌড়িই সেই দিন সার হইল। কার্য্য, ব্যবসার কথা মনে নাই এবং এইভাবে প্রায় বিকাল ৩/৪ টা পর্যন্ত কাটিয়া গেল। তখন শুনিতেছি, বাঙালী সৈন্যরা কুমিরা রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন যক্ষ্মা হাসপাতালে ঘাঁটি করিয়াছে। বাজার হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় আধ-মাইল। নিত্য প্রথামত দৈনিক বাজার বসিয়াছে, অবশ্য প্রতিদিন রাস্তার ধারে যেই স্থানে বসিত সেই স্থানের সাধারণ পশ্চিমে ও আমার নিজ বাসস্থানের সাধারণ পূর্বদিকে একটি খোলা জমিতে বাজার বসিয়াছে [কারণ কোন কোন বাজারে মিলেটারীরা হেলিকাপ্টার থেকে মেশিনগান চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করেছে]। এদিকে কুমিরায় সবারই মন টানা, পাঞ্জাবী আসিতেছে, দেখিতে হইবে।

আমি দোকানের বাহিরের দিক বন্ধ করিয়া ভিতরে রোগীপত্র বিদায় কতিছি। এমন সময় কয়েকজন বন্ধু আসিয়া আমাকে বাড়ী চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেয়। আমি বাহির হইলাম, দুই একজন রোগীও আমার পিছু ছুটিল, কারণ যতই ঝামেলাই থাকুক না কেন, রোগ মানে না। গাড়ী নাই, কিন্তু অনেক দুরগ্রাম হইতেও অনেক রোগী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছে।

বাড়ীতে আসিয়া উক্ত রোগী তিনজন ও ২/১ জন বন্ধুবান্ধবসহ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম পায়দলে পাঞ্জাবী সৈন্য দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। তখনও আমার নিজের ধারণা, আগেকার দিনের 'রাম-রাবণের' যুদ্ধের মত দুই দলে রাস্তার এই পাশে ও ঐ পাশে যুদ্ধ হইবে। ইহাতে আমাদের ক্ষতিই বা কি?

পাঞ্জাবী আর দেখা যাইতেছে না। রোগী তিনজন ঔষধের জন্য তাড়াহুড়া করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ১নং মোহাং কামাল কাদের (আলেকদিয়া), ২নং আবুল কালাম (মঘপুকুরিয়া) এবং ৩নং রায়মোহন (ঘোড়ামারা)। কোনক্রমে ১নং রোগীকে ঔষধ দেওয়ার

পর উনি বলিলেন: 'ডাক্তারদা আমার ঔষধ ও কাপড়ের বান্ডিলটা রহিল, আমি একটু দেখিয়া আসি।'

২নং ও ৩নং দুইজনের ঔষধ এক সাথে তৈয়ার করিয়া একসাথে সেবনবিধি বুঝাইয়া দিব ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ বিকট শব্দ ট্র-ট্র-ট্র-ট্র-ট্র-ট্র-ট্র-ট্র-ঢুম্-শোঁ-শোঁ, শোঁ-শোঁ। এতগুলি আওয়াজ ও এত অগ্নিকণা আর দেখি বা শুনি নাই। এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহা জানিও না। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শুনিয়াছিলাম, 'সাইরেন' নামে বিপদ-সংকেত বাজিত, কিন্তু কই? কোথায় গেল আমার রোগীপত্র, কোথায় গেল হাটবাজার, ছোট বাচ্চাকাচ্চাসহ কোঠায় ঢুকিয়া পড়িলাম। প্রথম দিকে গুলি শুধু উত্তরাভিমুখে গিয়াছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে অনবরতঃ গুলি শুরু হইল এবং গুলি যে কোন দিক হইতে পড়ে তাহা বুঝা মুস্কিল। রান্নাবান্না ও খাওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ছোট ভাই হিরণ্ময়, ভগ্নীপতি অমিয় বাবু, ভাইপো দুলাল চৌধুরী, বিশিষ্ট বন্ধু মাষ্টার সন্তোষ বাবু ও প্রাণের জেঠা মনোরঞ্জন বাবু... এঁদের সবাইর জন্য চিন্তা।

যখন সন্ধ্যায় ছায়া পার হইয়া রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল, তখন ছোট ভাই হিরণ্ময় ও অমিয়বাবু কোন রকমে পলাইয়া ও কাঁটার আঁচড় খাইয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তখন দেখি, আমার পাকের ঘর, বাহিরের বৈঠকখানা ও অন্যান্য ঘরে প্রবেশপথ নাই। বাজারের পথিক, উক্ত ১নং ও ৩নং রোগী ও বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণ সবাই সেখানে বসিয়া আছে। হঠাৎ শোঁ করিয়া একটি গুলি আসিয়া আমার চায়ের ঘর ভেদ করিয়া ঢেঁকি ঘরে গিয়া পড়িল। হায়রে হায়, আমরা দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়া গুলি চলিয়া গেল। প্রথম যাত্রায় দুই ভাই-ই রক্ষা পাইলাম।

আমি পূর্ব হইতেই ভীতু ছিলাম। আমার শরীরে কম্প দিয়া মাথা ঘুরা আরম্ভ হইল। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া আমাকে কেহ কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে হীরেন্দ্র (ননী) প্রধান। একটু তন্দ্রার মত আসিল। আর বলিতে পারি না।

পাঁচ (২য়)

ভাস্তুরে বিয়ে আকাশ পাতাল দেখা যায়, যাহুরে কাছেই, অমন
ঝাঁঝাল, কমন তখনে এতদে সাজন চলিতেছে, মনের মনের হইয়া
"কেজেট কলেজের" ছাত্রী হইতে কয়েক পাড়ী পাড়ে শেষ পর্যন্ত
কুমিল্লা পর্যন্ত ছোটাছুটি করিতেছে। কেন লোকদের ধরে নানা রকম
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বিশেষ করে সাওয়ারী গাড়ীর কর্মী সম্পর্কে, হয়
ধিক্কার ও চোখ রাঙ্গাইয়া করে। তেমন প্রাণ নাকাকরোপ্রী করে ওর,
পরে শুনিতেছি, কলেজ হাটের কাছে বাড়ীর সব সময় ছেলে
লোকের ভয়ে চলিয়া আসিতেছে। হঠাৎ শুনিতে করে, আমার ছেলে
সময় স্কুলের "কেলেট" ও ছোট ছেলেকে নিয়ে যেত, আবার
সময়ে প্রশ্ন করে, "তোমা হিন্দু আমানী হাম?" মিথ্যা কথা কে
কই? শেষে আরও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন:- প্রয়োজন শেষে শোর পর্যন্ত
পর্যন্ত হয়।

তখন অন্যান্য লোক কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি গ্রাম
কেহ আবার কুমিল্লা পাহাড়ের চালে পার হইয়া হাঁটাহাঁটি, গাড়ি
পালাইতেছে, কেহ পাহাড়ের মাটি খেয়ে, চেহারে, পাকপোষা ও
হারাইয়া ফিরিয়া যিয়াছে ইত্যাদি॥

হঠাৎ রাত্রি সাড়ে দশটায় জাগরিত হলাম। তখন গুলিগোলার শব্দ কম, কিন্তু চলিতেছে। তখন দক্ষিণ কোঠায় দেখি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও ছেলেবেলার বিদ্যালয়ের সাথী উপস্থিত আছেন। তাঁহারা ক্রমে আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। রাতেও গোলাগুলি কিছু চলেছে। ঘুমে ছিলাম, সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আবার গোলাগুলি শুরু হইল।

২৭শে মার্চ, ১৯৭১, শনিবার

সকালে প্রায় ৮টা পর্যন্ত ধুমধাম আওয়াজ শুনিলাম। ভয়ে আত্মহারা হইয়া পূর্ব্ব রাত্রের মতই কোঠাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পরিবারের প্রত্যেকটা প্রাণীই বসিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে এক ঘন্টা কাটিয়া গেল। প্রায় নয়টার সময় শান্ত পরিবেশ মনে করিলাম। পাশের চৌধুরীদের বাড়ীতে বিশেষতঃ বিমল চৌধুরীর (টুকু চৌধুরী) বাড়ীতে বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক পূর্বরাত্রেই আশ্রয় নিয়েছিলেন, তন্মধ্যে:

১। ডাঃ এম.এ. জামান (এম.বি.বি.এস.) ও তাঁহার পত্নী
২। ডাঃ আজমল হোসেন খান (সরকারি হাসপাতাল),
তাঁহার স্ত্রী ও পঞ্চকন্যা
৩। ডাঃ হারেচ আহম্মদ এবং
৪। মৌঃ মমতাজুল করিম (তহশীলদার, কুমিরা)

উক্ত আশ্রিত ব্যক্তিদের সবাইর সঙ্গে আমি ওতপ্রেতভাবে জড়িত। একটু আলাপ করিব ভাবিয়া চৌধুরীবাড়ী গেলাম ও মাত্র ৫/৭ মিনিট আলাপের পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর আমার মা (শ্রীমতি চারুবালা দেবী) আমার মেয়ে মিষ্টিকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের দেখিতে গেলেন। উনিও উঠানে গিয়া হাজির এবং অমনি আবার ট্র-ট্র-ট্র, শোঁ, শোঁ, শোঁ আওয়াজ শুরু। আশ্রিত ব্যক্তিরা আমার মায়ের কথা চিন্তা না করিয়াই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা গুলির মধ্য দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আমার ঘরের দরজা-জানালা আবার বন্ধ হইল।

কিছুক্ষণ পর আবার সব শান্ত। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা দিয়া পাক সৈন্য (সশস্ত্র) ঘুরাঘুরি করিতেছে। রাজাপুর, মছজিদ্যা, আকিলপুর, কাজীপাড়া, জমাদারপাড়া ও অন্যান্য গ্রামে। শুনিতেছি, কয়েকজন পাক-সৈন্যের গুলিতে আহত এবং নিহত হইয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকে। প্রায় বারোটা বাজে কিন্তু নিজ বাড়ীতে নিত্য পূজার ব্রাহ্মণ তখনও আসেন নাই। ব্রাহ্মণের গ্রাম মছজিদ্যা, এই দুর্যোগে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আসিবেন না, ইহাই মনে করিলাম। কাজেই নিজে স্নান করিয়া নিজ মণ্ডপে পূজা সারিয়া পাশে চৌধুরী বাড়ীর নিত্য জগদ্ধাত্রী পূজা সমাপন করিলাম।

এইভাবে পূজার দায়িত্ব আমিই পালন করিতে লাগিলাম।

* * *

সেদিন শনিবার, কুমিরায় হাটের দিন। অন্যান্য শনিবার এমন সময়ে দুপুর বেলায় রাস্তা লোকে লোকারণ্য, অথচ আজ মানুষ নাই। রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে। রেডিওর সঙ্গে স্তুপে স্তুপে ২০/২৫ জন বসা। মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছে সবাইর, আমার শুধু হয় নাই। যাহা হোক, প্রায় ২টার সময় হঠাৎ প্রাণের জেঠা (মনোরঞ্জন দে) আসিয়া হাজির। ভয়ে, মুখ জড়সড়। তখন আমি আর জেঠা একসঙ্গে খাইতে বসিলাম। পূর্ব্বদিন গোলাগুলির কারণে মাংস ও অন্যান্য সারভোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। দুই জনে খাইতে বসিয়াছি, পুনঃ গোলাগুলি শুরু। তখন 'দুই বন্ধু ও ভল্লুকের গল্প' এর মত জেটার কথা না ভাবিয়া 'মাংস ভাত' ফেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। গোলাগুলি অবশ্য বেশিক্ষণ হইল না। মনে হয়, যুদ্ধের তালিম দিতেছে।

বেলা প্রায় ৩টার সময় রেডিওতে সংবাদ প্রচারিত হইল (মিথ্যা বা ভুল সংবাদ): 'লেঃ জেঃ টিক্কাখান সদলবলে নিহত'। উপস্থিত শ্রোতাগণ মুহূর্তের জন্য আনন্দিত হইল। তখন বারান্দায় লোকজন আলাপ করিতেছেন, কি করা যায়? কারণ গ্রামের প্রায় লোক দলে

দলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিজ বাস ছাড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইতেছে। কেহ আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে, কিন্তু সবাই উত্তরাভিমুখে ধাওয়া হইতেছে।

এই করুণ দৃশ্যে সবাইর মন বিচলিত হইল। আমাদের পাড়ারও কেহ কেহ বিশেষতঃ চৌধুরী বাড়ীর সবাই ও উক্ত আশ্রিত ডাক্তারদ্বয়ের পরিবার উত্তরাভিমুখে রওনা হইল। যিনি যানবাহন ছাড়া কখনও চলেন নাই, আজ ইজ্জতের চরম কোঠায় তিনি রৌদ্রে পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন। উপস্থিত অনিলবাবু ও আমাদের ইন্টারন্যাশানেল (International) মামা (অর্থাৎ ছোট-বড় সবার মামা) বাবু নিরঞ্জন চৌধুরী, বাবু সুবোধ চৌধুরী ও অন্যরা চলিলেন বাস্তুত্যাগ করিয়া... দূরে ও অনির্দিষ্ট ঠিকানায়।

ইতিপূর্বে জলোচ্ছাস, ভূ-কম্পন, তুফান ও অনেক দুর্যোগের মধ্যেও বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। সবাই বাস্তুত্যাগ করাতে আমার কি রকম বোধ হইল তাহা বুঝিতে পারি হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে, কিন্তু বুঝাইবার মত ভাষা নাই।

অভিভাবক গোছের লোক নরেনবাবু (নরেন্দ্র দাশ), তাঁহার সহকর্মী শৈলেন, ছোট ভাই হিরণ্ময় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিল না। আমরা কয়েকটা পরিবার থাকিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর খবর আসিল: বাজারে সাধারণ উত্তরে ফকির বাড়ীর মসজিদে পুনঃ তের ট্রাক পাঞ্জাবী সৈন্য ঘাঁটি করেছে। মনে হইল, এইবার আর নিস্তার নাই। দিন থাকিতেই সন্ধ্যার আবছায়া নামিল, ভয়-ভয়-ভয়, সে কি ভয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দও নাই। চুপি চুপি কথা বলিতেছি। কোন রকমে পেটুক মহাজনের খাজানা চুকাইয়া [অর্থাৎ 'রাতের খাবার খেয়ে'] শুইলাম। চৌধুরী বাড়ীর সবাই চলিয়া গেল। ভাইপো দুই জন দুলাল চৌধুরী ও মুকুল চৌধুরী (ঝুনু) [এরা প্রতিবেশী সুবোধ চৌধুরীর পুত্র] এবং হীরেন্দ্র (ননী) সবাই শুইয়া কথাবার্তা বলিতেছে। গুলি চলিল, তবে অবস্থা পুর্ব্ব রাত্রের মত ভয়াভহ রকমের নহে। কোন রকমে রাত্রি প্রভাত হইল।

এদিকে দোকানপাট বন্ধ ও বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে আবুল কাসেম (লেদু), আমিনুর রহমান (IWTA এর কর্মচারী), আবদুল রহিম, শামসুল হক, ভাগিনা ইউনুছ এবং চাঁন মিয়া Cat বলী [চান মিয়াকে আড়ালে 'Cat বলী' বলা হতো]। সবাই প্রাণভয়ে ভীত ও কাহারও দেখা নাই। জেঠা মাখন বাবু ঘণ্টায় পঁচিশবার বাবাজীর (অর্থাৎ লিখকের) মত কি জানিতে ব্যস্ত।

২৮শে মার্চ, ৭১ইং, রবিবার

রবিবার সকালে প্রথম একদফা খুবই শব্দ শুনিলাম। শব্দগুলি খুবই ভীষণ। কিসের শব্দ তাহা পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সকাল সাতটায় দেখি দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কুমিরা যক্ষ্মা হাসপাতালের দিকে ঢাকা ট্রাংক রোড়ের দুই পাশেই আগুনের শিখা। ধুয়াঁ ও পোড়া ছাই উড়িয়া আসিতেছে এবং ঘরদুয়ার সব ছাইময় হইতেছে। শব্দ নাই, বারান্দায় দাড়াইয়া লক্ষ্য করিলাম ২/১ জন লোক সামনের গ্রাম্য রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, বাঙালী সৈনরা কোথায় তাহারা জানে না, তবে পাক-সরকার বাহিনী দক্ষিণ দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে যাইতে সরকারী রাস্তার দুই পাশে ২০০ (দুইশত) ফুট আগুনে ধ্বংস করিতেছে। কোন লোক দেখিলে হাত পা বাঁধিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিতেছে বা গুলি করিয়া মারিতেছে। তবে বিশেষত্ব এই যে কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা রমণীর তেমন কোন ক্ষতি তাহারা করে নাই।

ইতিমধ্যে অনেকে বুদ্ধির তীক্ষতা জাহির করিবার মানসে জাতীয় পতাকা (Pakistani flag) উত্তোলন করিয়া দিয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের বাড়ীও বাদ যায় নাই।

রবিবার সন্ধ্যা ও সোমবার শান্ত অবস্থা। বহুদিন আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘোড়ামারা নিবাসী মৌং নিজামপুরী (মৌঃ ফোরক, যিনি স্বদেশী পোশাক পরিধান করিতেন) এক কবিতা বাহির করিয়াছিলেন :

"চট্টগ্রামের ভয়াভহ কাহিনী শুনে পলায় বনের প্রাণী
তবখানা [তোপখানা বা অস্ত্রাগার] বিদ্রোহী রাণা
অবশেষে আগুন দেয় না,
পথে ঘাটে শূন্য মটর মৃতদেহে পূর্ণ শহর।
মৃতদেহে পূর্ণ শহর"

বোধ হয় সেই রকম শান্ত অবস্থা। রাস্তাঘাট প্রায় অচল, অনেক কষ্টে লোকেরা বঙ্গোপসাগরের ধার দিয়ে হাঁটা-হাঁটি করিতেছে। শুনিতেছি, পাঞ্জাবীরা ফৌজদার হাট কেডেট কলেজে ঘাঁটি করিয়াছে। অনেকে ভয়ে ট্রেনসে আশ্রয় নিয়াছিল, কিন্তু সেইখানেও দুষ্টের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। দুপুরে শুনিলাম, বার আওলিয়াতে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হরিলাল দর্জিও একজন।

২৯শে মার্চ্চ, ১৯৭১, সোমবার

দরজা বন্ধ অবস্থায় দোকানপাট চলিতেছে, রাস্তাঘাট-শহরে-বন্দরে যাওয়ার ও মাল আনার কোন ব্যবস্থা বা প্রয়োজন নাই। দোকানীরা কোনক্রমে অবশিষ্ট মাল বিক্রি করিয়া দোকান খালি করিবার চেষ্টায় আছে, কারণ লুটতরাজ হইলে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দোকান শুরু করিলাম। কিসের ডাক্তারী? ভয়ে নিজের বাবার নাম ভুলিবার উপক্রম।

যাহা হউক, দেখি, দলে দলে কাতারে কাতারে লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়া, রিক্ত হস্তে, সরকারি রাস্তায় চট্টগ্রাম শহরের দিক হইতে উত্তরদিকে চলিয়াছে। জিজ্ঞাসাবাদেও বিরক্ত হয়, কারণ তাহারা বাস্তহারা ও হৃদয়ভাঙ্গা। অবস্থা দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল এবং শনিবারের পলাতক লোকেরা পুনঃ (কুমিরা গ্রামের) নিজ বাসভবনে ফিরিতে লাগিল। পাশের চৌধুরী বাড়ীর লোকেরাও ফিরিয়া আসিল।

তখন লোকের মনে ভয়। 'টক' করিয়া ঘড়ির কাঁটার শব্দেও জাগরিত হই।

দুপুরের খাওয়ার পরেই সমুদ্রের দিকে ভীষণ চিৎকার। অল্প তুফানের বাতাসের মতই অস্পষ্ট সেই চিৎকার। লোকেরা গত দিনের মত কেবল স্ত্রী ও পুত্র-পরিজন নিয়া দৌড়াইতেছে। ছোট ভাই হিরণ্ময়, নরেন বাবু ও শৈলেন বাবুসহ কয়েকজন ঘটনাস্থলে গিয়া খবর নিয়া আসার আগেই লোকেরা দৌড়াইতেছে, জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে দিতেই দৌড়াইতেছেঃ 'মানোয়ার' (Man of War) আসিতেছে!

উক্ত 'মানোয়ার' আগে দেখিয়াছি, তাই বঙ্গোপসাগরে কিভাবে এত বড় জাহাজ আসিতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না। তখন যুক্তি ও তর্কের অভাব নাই। কেহ বলিল, মনোয়ার অনেক দুরে থাকিবে এবং বোট নিয়া তীরে আসিয়া গুলি চালাইবে।

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী অভিভাবক শ্রী সুবোধ চৌধুরী সমস্ত পরিবারবর্গকে নিয়া পুনঃ ছুটিলেন এবং পরে শুনিলাম তাঁহারা নাকি বোনের বাড়ীতে (মিরেশ্বরাই) আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্বের মত তাহাদের ছেলে দুটি ঝুনা ও দুলাল আমার সঙ্গে আছে। তাহাদের কি হইল সে কথা পরে জানিবেন। লিখক নই, তাই এলোমেলো হইয়া যায়। পাঠকবর্গ নিজ গুনে বুঝিয়া নিবেন।

উক্ত 'সাংবাদিকেরা' সংবাদ নিয়া আসিলঃ 'সমুদ্রের বাতাস দারুণ শান্ত, 'মানোয়ার' বা 'জানোয়ার' কিছুই দেখিলাম না!'

দোকারপাট সাধারণভাবে চালাইতেছি। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে শহরের অবস্থা কাহিল। জমা ঔষধ শেষ, তাই রোগীদের নিয়া কষ্টে পড়িলাম।

৩০শে মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ইং

বাস্তহারার দল চলিতেছে। বিরাম নাই, কোথায় যাইবে হদিস নাই, আবার কৃপণ কৃষক ও লোভী ব্যবসায়ীরা ভিতরে ভিতরে তাদের কার্য্য হাসিলে ব্যস্ত। বন্ধু-বান্ধুবদেরও পুনর্মিলন হইতেছে, কিন্তু স্থায়ী মিলন নহে। রেডিওর খবরের পরে আর কাহাকেও পাওয়া যায় না।

প্রায় সবাই গ্রামান্তরে, আত্মীয়ের বাসায়। তবে তখনও কুমিরা মেইন গ্রামে তেমন অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ হয় নাই।

> চাটনি: পাঠকবর্গ, আমি গৌহাটি শফরে গিয়া গত দুই রাত্র অনিদ্রায় কাহিল। আমি আপনাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে ইচ্ছুক। [সময়: দুপুর ২/১০ মিঃ, তাং-৪/৮/৭১ইং]

কুমিরা গ্রামে আস্তে আস্তে নানা বিশৃঙ্খলা শুরু হইতেছে। কারণ 'এডমিনিস্ট্রেশন' বন্ধ। থানা, কোর্ট-কাচারী, স্কুল-কলেজ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কিছুই নাই। সুতরাং নিরীহ ও সভ্য লোকদের কিছু কষ্ট হইতেছে। 'লুট' সাধারণভাবে চলিতেছে। অবশ্য জনসাধারণের নহে, সরকারী মাল মাত্রার ক্ষয়-ক্ষতি হইতেছে।

প্রায় সন্ধ্যার পরে বড় বড় আওয়াজ ও বহু দুরে আগুনের শিখায় আকাশ লালবর্ণ দেখা যায়। শহরের কাছেই, আজ এখানে, কাল ওখানে এভাবে আগুন দেওয়া চলিতেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কেডেট কলেজের ঘাঁটি হইতে কয়েক গাড়ী পাক সৈন্য সশস্ত্রে কুমিরা পর্যন্ত ঘোড়াঘুড়ি করিতেছে। হঠাৎ কোন লোককে ধরে, নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী সম্বন্ধে, হয়ত ধাক্কা ও চপেটাঘাত করে। তবে তেমন প্রাণনাশ করে নাই কারওর।

পরে শুনিতেছি, কর্নেল হাটের কাছে রাস্তায় সব সময় টহল থাকে। লোকেরা ভয়ে চলিয়া আসিতেছে। হঠাৎ গুলি করে। আবার কোন সময়ে প্রশ্ন করে, 'তোম্ হিন্দু আদ্‌মী হ্যায়?' মিথ্যা বলার জো কই? শেষে আরও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, প্রয়োজনবোধে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত হয়।

তখন কিছু কিছু লোক কুমিরা পাহাড়ের ঢালা পার হইয়া হাটহাজারি, নাজির হাটের দিকে পলাইয়াছে। কেহ আবার পাহাড়ের মধ্যে মেয়ে, ছেলে, টাকাপয়সা হারাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ইত্যাদি।

আমি বাড়ীতে বসিয়াই ডাক্তার করিতেছি। রোগীপত্র ঔষধ নিতেছে, পয়সাও কোনরকম হয়। কিন্তু 'সুগার অফ মিল্ক' নাই, শহরে যাওয়ার লোকও নাই। কোন ব্যবসায়ী অনেক ভয়ে ভয়ে দুই/এক পদ মালমাত্রা শহর হইতে আনিয়া (হাঁটিয়া) গ্রামে বিক্রী

করিতেছে। আবার পাঞ্জাবীর দয়ায় মাল হারাইয়াও আসিতেছে। একদিন ভাগিনা ইউনুস শহরে গিয়ে কোন রকমে সাধারণ ঔষধ ও উক্ত সুগার আনিয়া দিল। কিন্তু দুই দুই বার সীতাকুন্ড গিয়াও হীরেন্দ্র (ননী) কোন ঔষধ পায় নাই।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, তারিখ ও তিথি-নক্ষত্র মনে নাই। হঠাৎ দুপুর দেড়টার সময় আমার উপদেষ্টা ও ভগ্নীপতি গুরুপদ বাবু (PTC অর্থাৎ 'পাকিস্তান ট্যোবাকো কোম্পানী'র কর্মচারী) আসিয়া উপস্থিত। তাহাঁদের বর্তমান বাসা দক্ষিণ কাট্টলী, সাগরিকা রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে। তখন আমি সবেমাত্র বাড়ীর পূজা সারিয়া ঘরে ঢুকিতেছি।

'কানাই', এখনও তুমি পুজা করিতেছ, পান-চা খাও?

গুরুপদ বাবুর কথায় আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল। তাঁহার কথা কৌতুক-রঙ্গ বলিয়াও মনে হয় না, আবার অবাস্তব প্রশ্নেরইবা কি জবাব দিব? ইতস্ততঃ করিতেই পুনঃ প্রশ্নের রোল উঠিল।

তিনি বলিলেন: 'আমাদের বাড়ি পোড়াইয়া দিবার পর আমরা কোন রকমে ভাটিয়ারী অমুক বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছি। আগামী রবিবার সবাই হাঁটিয়া ছুটিব, হয়তো এই ছুটাতেই একেবারে ভারত সীমান্ত।'

১৯৪৭ সালের পরে বারে বারে অনেক হিন্দু ভারতে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মানের সহিত ছিলাম বলিয়া স্থানান্তর হইবার কথা আমাদের কল্পনার বাহিরে ছিল।

১০/১৫ মিনিট আলোচনার পর গুরুপদ বাবু চলিয়া গেলেন, আজ (৫/৮/৭১, পুনঃ ১৯/১২/৭১ইং) পর্যন্ত যোগাযোগ নাই। এদিকে সীতাকুন্ডে বাঙালী সৈন্যরা পুনঃ শক্তভাবে ঘাঁটি করিল এবং ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন রেলওয়ে কলোনীর মেয়ে নমিতা সাহা (দশম মান, কুমিরা উচ্চ বিদ্যালয়) আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছে। তখন আমাদের

পাড়ার ও গ্রামের অনেক লোক পুনঃ গ্রামান্তরে সরিয়া যাইতেছিল নিরাপত্তার খোঁজে।

গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে আর আমরা মাত্র কয়েক পরিবার আছি। তখন অনেক স্থানীয় লোকের (বিশেষত মুসলিম) ধারণা, হিন্দু যদি বাড়ীতে না থাকে তবে সে নিশ্চয়ই হিন্দুস্থান (India) চলিয়া গিয়াছে। বন্ধু-বান্ধুবও অনেকে প্রশ্ন করিল: 'সুনীল বাবু ও অন্যান্য সবাই বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু আপনি কবে যাইবেন?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে জবাব: 'যেদিন কুমিরা গ্রামে একটা মুসলমানও থাকিবে না, সেই দিন আমি যাইব, এর আগে নয়।' শক্ত প্রশ্নের শক্ত জবাব বিশ্বাসযোগ্য, কারণ কোন দিন বাড়ী ছাড়িয়া যাইব ঐ কল্পনা নিজেরও ছিল না।

অনেক প্রতিবেশী গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার সময় আমাদের বাড়ীতে অনেক মালমাত্রাও রাখিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে থাকিয়া সেগুলি পাহাড়া দেওয়ার কাজও চলিতেছে। এদিকে প্রাণের জেঠা মনোরঞ্জন বাবু বর্তমান বাড়ীতে গিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেখিবার জন্য কোন রকমে পাহাড়ের ভিতর দিয়া অন্য লোকদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। স্থায়ী কমপাউন্ডার শ্রী খোকন চন্দ্র ধর (পটীয়া থানা, সুচিয়া, বাইনজুরি গ্রাম) এই ঝামেলার পূর্ণ এক সপ্তাহ আগে অসুখবশতঃ বাড়ী গিয়াছিল। তাহার খবর অন্য অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এদিকে শুনাশুনি ও বলাবলির অন্ত নাই। বাঙালী সৈন্যদের ঘাঁটি কুমিরায় স্থান নিয়াছে। এই ভাবে দুই একদিন চলিল।

হঠাৎ একদিন মঙ্গলবার সাধারণভাবে দোকানে বসিয়া আছি, এমতাবস্থায় দেখি, সবাই দৌঁড়াদৌড়ি করিতেছে। কেবল শুনি: 'আসিতেছে'। কি আসিতেছে তাহার হদিস নাই। শুধু যে যেদিকে পারে, দৌঁড়াইতেছে। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া এক দৌড়ে বাড়ীর বারান্দায়। তখন লেদু ও হীরেন্দ্র (ননী) বাজারে গিয়া দোকান বন্ধ করিয়া আমার সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বাড়ীতে লইয়া গেল। সন্তোষ বাবুও দোকানে ছিলেন, কখন যে উনি পালাইয়া গেলেন তাহা আমার দৃষ্টির অগোচরে ছিল।

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার,
ডাকঘর:- কুমিরা,
জিলা:- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

গুলি ছাড়িয়া অনেক লোককে আহত ও নিহত করিয়াছে, ইহাতে প্রমাণ,
"হিন্দু-মুসলমান, মুসলিম বা আওয়ামীলীগ প্রশ্ন নাই, প্রশ্ন সৃষ্টি
অহংকার অন্ধালী"।

তারপর গ্রাম আবার খালি হইয়াছে, বই লেখে দিন যাচ্ছে আমার
ক্রোধ বাড়ছে। ১৪ই এপ্রিল বুধবার আসিয়া পড়িল,

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার,
ডাকঘর:- কুমিরা,
জিলা:- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

১৪ই এপ্রিল - ৩১শে চৈত্র/৭৭ বঙ্গাব্দ
"বুধবার - চৈত্র সংক্রান্তি"

সেদিন চৈত্র-সংক্রান্তি, "চরক-পূজা" এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাধিস্থল
পরিদর্শন নূতন প্রজন্ম। নূতন প্রজন্ম হিন্দুদের মধ্যে নূতন প্রজন্ম
ব্যবসায়ীর নববর্ষ হালখাতা সবের - হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে
ঈদ সবের ভোর দিয়ে, কিন্তু এই কয়ে "চরক-পূজার" পর হিন্দু
তীর্থ স্থানের অস্তিত্ব পাকিস্তানে নষ্ট করছে, সঙ্গে সঙ্গে —

এদিকে দৌঁড়াদৌড়িতে জেঠা মাখন বাবু বেচাকেনার ধার না ধারিয়া একজোড়া চপ্পল ও দাঁড়িপাল্লা ফেলিয়া কেবল চনাবুটের লাই নিয়া কোন রকমে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। শেষে অনেকক্ষণ পর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে জানা গেল, পাক-বাহিনী উড়োজাহাজ হইতে সীতাকুণ্ড, মিরেশ্বরাই, ইত্যাদি ২-৩টি বাজারে একসঙ্গে মেশিনগানে গুলি ছাড়িয়া অনেক লোককে আহত ও নিহত করিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগের প্রশ্ন নাই, শুধু 'অভাগা বাঙ্গালী'-কে হত্যা করাই তাহাদের মূল লক্ষ্য।

গ্রাম দিন দিন আরও খালি হইতেছে, এইভাবে, দিন যায় কথা থাকে, কোন রকমে ১৪ই এপ্রিল বুধবার আসিয়া পড়িল।

দুই। চৈত্র সংক্রান্তি

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১; ৩১শে চৈত্র, ৭৭ বাং; বুধবার

সেদিন চৈত্র-সংক্রান্তি 'চড়কপূজা'। পুরাতন বৎসর সমাধা করিয়া পরদিন নূতন প্রভাত। নূতন বৎসর হিন্দুদের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার করিয়া থাকে। ব্যবসায়ীদের হালখাতা-মহরৎ হিসাবে মুসলমানদের জন্যেও নববর্ষ উৎসবের দিন ছিল। কিন্তু এই বৎসর দোলপূজার পর হিন্দুর অনেক তীর্থস্থানের অস্তিত্ব পাক সৈন্যেরা নষ্ট করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মসজিদও। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ষণ নাই। স্থানীয় লোক অনেকে চলিয়া গিয়াছে, তাই বুঝি ধরার এত বিষাদ, এত ক্রন্দন। বাতাসও প্রতি মুহূর্তেই ভয়ের বাণী বহন করিয়া আনিতেছে। অচল অবস্থায় চলিতেছি। মন কেমন করে। দুপুরে ধরার অশ্রুজলও বর্ষণ হইল।

তিন। নববর্ষ

১লা বৈশাখ, ৭৮ বাং, বৃহস্পতিবার; ১৫ই এপ্রিল, ৭১ইং

১লা বৈশাখ/৭৮, বাংলা। দিনটি কত সুন্দর থাকার কথা, কিন্তু আজ সবই নীরব, নিস্তব্ধ। চারিদিকে প্রাণের ছটফটানি ও কাতরতা। ভয়ে ভয়ে সকাল দশটায় পূজামণ্ডপে পূজার নিমিত্ত ঢুকিলাম। পূজা-অর্চ্চনার পূর্ব্বেই শুনিলাম 'দৈববাণী': 'চলিয়া যাও'! এই বৈজ্ঞানিক যুগেও ধর্মভীরু লোকের অভাব নাই, আবার একজন ডাক্তার হিসাবে এ ধরণের কথা আমাকে বিশ্বাস করানো কষ্ট। যাহা হোক, দৈববাণীই হোক আর মনের ধারণাই হোক, যাহা শুনিলাম তাহারই বিবৃতি দিলাম।

অন্যান্য বৎসর নববর্ষে পূজার যোগাড় ও গীতাপাঠ ইত্যাদি অনেক কিছুই হইত। এ বছরও দেবতার ভোগ তৈরি সাধারণভাবে হইয়াছিল, তাহা পাত্রের মধ্যেই রহিল। ঠাকুরের দৃষ্টিগোচর করিতে পারি নাই। পাশের চৌধুরী বাড়ীর জগদ্ধাত্রী মন্দিরেও একই অবস্থা। ঠিক এমনি সময়ে আবার ভীষণ আওয়াজ ও পুনঃ পোড়া ছাই উড়িয়া আসিতে লাগিল। ভয়ের ক্রমে বয়স বাড়িতেছে। তারপরও সুষ্ঠুভাবে পুজা-অর্চ্চনার অনুরোধ আসিল বিধবা মায়ের পক্ষ হইতে। উনি একটু আজকালকার ফেশনে অসুবিধা অনুভব করিতেন, কারণ 'সেকেলে'।

শুনিলাম, হঠাৎ পাক-সৈন্য আসিয়া ঘোড়ামারা নিবাসী মোহাং খায়ের হোসেনের (রেনুর বাপ) গাড়ী ও বাড়ী এবং ২/১ খানা ঘর পোড়াইয়া দিয়া পুনঃ গন্তব্যস্থলে পলাইয়া গেলে বাঙালী সৈন্যরা তাহাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়িতেছে। অবশ্য সত্যমিথ্যা জানি না। সবই শুনা কথা। আমি নিজে বাড়ীর বাহির হই না।

বিকালে দেখি, স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে জনাব মনিরউল্লাহ (বি.এস.সি.) এবং আরও অনেক চলিয়া যাইতেছেন। তখন আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিবার উদ্দেশ্যে এক পরিবার আসিয়া হাজির, নামঃ শ্রী বিনোদ শুক্লদাস। তার বাবা (নগেন্দ্র বধির)

আমাদের বাড়ীতে কাজ করিত। উক্ত বিনোদ আমার ছাত্র, তদুপরি স্থায়ী ক্রেতা হিসাবেও তাহাকে আদর করিতাম। সঙ্গে তাহার বৃদ্ধা মাতা ও নববধুও আসিয়াছে, সাধারণ মালামালও সাথে ছিল।

সন্ধ্যায় 'নববর্ষের ধূপধুনা' দিব ভাবিয়া সঙ্গী আবুল কাসেম লেদুকে নিয়া দোকানে গেলাম এবং ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রেডিও নিয়া বসিলাম। প্রায় রাত দশটায় লেদু বাড়ী চলিয়া গেল।

আবার প্রতিবেশীর আনাগোনা ও প্রশ্ন: 'কানাই! কি করিয়া কিভাবে থাকিবে? সব চলিয়া যাইতেছে।'

এত দিন সবাইর মন শক্ত ছিল। সেদিন হিরণ্ময়, হীরেন্দ্র (নুনু) সন্তোষ বাবু, ঝুনা, দুলা ও অমিয় বাবুরও সুর সাধারণ পরিবর্তন হইল।

এদিকে জেঠা মাখন বাবুর সঙ্গে সর্ত্ত ছিল, আমি সেখানে যাই, তাহাকেও সঙ্গে নিতে হইবে। পয়সা খরচ নিজের তবুও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া আমার পাশ লইল। আমার নিজের সমস্ত কাজ 'পরস্মৈপদী', তবুও কথা দিলাম।

রাত গভীর হইতে লাগিল। চিন্তা করিতেছি, কি করা যায়। শুনিলাম, সেদিন সন্ধ্যায় বাঙালী সৈন্যরা স্থানীয় লোকজনের আশায় ছাই দিয়া সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিবার কথা বলিয়াছে। আবার যাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল পথে তাহাদের দুর্দশার কথাও শুনিতেছি। মনে ছিল, মরিলেও ঘরে মরিব।

চিন্তার রোল উঠিতেছে। কিন্তু যদি না মারিয়া আহতই করে, যদি ইজ্জত-সম্ভ্রম যায় তখন কি হইবে? রাত্রীভোজ কোন রকমে সারিয়াছি। এমন সময় নরেন বাবু, শৈলেন বাবু, প্রিয়রঞ্জন ও বিনোদ শুক্লদাশ সবাই এই সমাধানে উপনীত হইলাম যে সীতাকুন্ড বা মিরেশ্বরাই কোন স্থানে ছেলেমেয়ে-স্ত্রীপরিজন নিয়া নিরাপদে দুই/এক দিনের জন্য আশ্রয় নিব। গণ্ডগোল থামিলে পুনঃ ফিরিয়া আসিব। নিজ মতে কাজ, কেহ কাহারও যুক্তির মধ্যে থাকিতে পারে

না। সময় খারাপ, উপস্থিত প্রাণ বাঁচাইতে হইবে। এভাবে ঘুম নাই, রাত্রি দেড়টায় শৈলেন বাবুকে দিয়া আমার জেঠা মাখন বাবুর নিকট খবর দিলাম, আগামী কাল সকাল ৮/৯ টায় রওনা হইব, কারণ তাহাকে কথা দিয়াছিলাম। একটা ছোট ব্যাগে সাধারণ ঔষধ নিলাম নিজ ছেলেদের জন্য। এ ছাড়া নিলাম একটা টর্চ, একটা ছাতা। টাকা পয়সা তেমন ছিল না, অলংকারও ছিল না। স্ত্রীর কাছে জমানো একশো টাকাই সম্বল, অন্তত ২/৪ দিন চলিবে।

অন্য কোন জিনিসপত্রও নেওয়া হইবে না। কারণ মা, হিরণ্ময় (ডাক নামঃ টুন্টু) ও ভগ্নীপতি অমিয় বাবু বাড়ী থাকার কথা। ছেলে-মেয়ে-বোন-ভাগিনা সবাইকে নিয়া আমি ও হীরেন্দ্র (নুনু) যাইব। সন্তোষ বাবু, ঝুনা, দুলাও যাইবে। শৈলেন বাবু ও নরেন বাবুও যাইবেন ইত্যাদি। রাত দুটায় একটু তন্দ্রা আসিল। প্রভাতে অন্য দিনের চাইতে দেরিতে উঠিলাম।

পূর্ব্ব রাত্রে মনে ছিল, সকালে ছেলে মেয়েদের ভাত খাওয়াইয়া রিক্সায় সীতাকুন্ডে যাইব। কিন্তু মানুষ গড়ে ভগবান ভাঙ্গে।

(রচনার সময়ঃ ৫/৮/৭১ইং; ৮/১০ মিনিট)

পুনশ্চঃ রাত্রে বসিয়া দেনাপাওনার খাতা ও হিরণ্ময়ের Certificate এর নকল সব তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। যদি সেই খাতাটা সঙ্গে নিয়া আসিতাম, তবে অনেক কাজ হইত।

তিন। গৃহত্যাগ

২রা বৈশাখ, ৭৮ বাং, শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১

'পরশমনি' যাত্রানাটকে গান শুনিয়াছিলাম:

'সুখের লাগিয়া বাঁধিনু এ ঘর
অনলে পুড়িয়া গেল"

সেই গানের প্রতি ছন্দই আমার বাস্তব জীবনের সুখসংলাপ।
(লিখার তারিখ: ৫/৮/৭১; ৫/৩০)

সেদিনটার কথা মনে উঠিলে আমার লোম শিহরিয়া উঠে। ভোর সাড়ে ছয়টার ছোট ভাই হিরণ্ময় সহ বৈরাগী পুকুরে মুখ ধুইবার নিমিত্ত ঘাটে বসিয়াছি, অমনি শুরু ধুম-ধাম। হঠাৎ মনে হইল, হয়ত বাঙালী সৈন্যরা ট্রেনিং দিতেছে। কিন্তু না, ক্রমে আওয়াজ বাড়িতে লাগিল। তাড়াতাড়ি অর্ধধৌত অবস্থায় ঘরে আসিয়া দেখি দুজন রোগী ঔষধের জন্য বসিয়া আছে।

তখনও গুলিগোলা চলিতেছে। কোন রকমে তাড়াতাড়ি রোগী দুজনকেই ঔষধ দিলাম, ১নং রোগী মোহাং নজরুল ইসলাম (মন্টু) কাজীপাড়া; ২নং রোগী মোহাং ফরিদ আহম্মদ, ঘোড়ামারা। তাহারা যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়াইল। শেষ পর্যন্ত সুস্থ শরীরে বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন কিনা কে জানে।

তারপর প্রাতরাশের পালা। তখনও ছেলেমেয়েরা ঘুম হইতে উঠে নাই। চা কোন রকম ২/১ জনে খাইয়াছি। তখন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধুব ও নিত্য আসা-যাওয়ার লোক, ঝুনা, মাস্টার সন্তোষ বাবুও আসিলেন। তখন আর ধৈর্য্য রাখিতে পরিলাম না, গত রাত্রের এলোমেলো ও অর্ধ গুছানো থলেটা কাঁধে নিলাম, ছাতাটা ভাগিনা শিশিরকে (ডাক নাম: মন্টু) দিলাম, কোলে বড় মেয়ে মিষ্টিকে নিলাম ও হুকুম করিলাম: 'সবাই বাহির হও!'

এত তাড়াতাড়ি এবং এত গুলিগোলার মধ্যে যে কিভাবে সবাই বাহির হইলাম তাহা মনে আছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিবার মত মনের অবস্থা এতদিন পর একমত হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবুও সঙ্গে

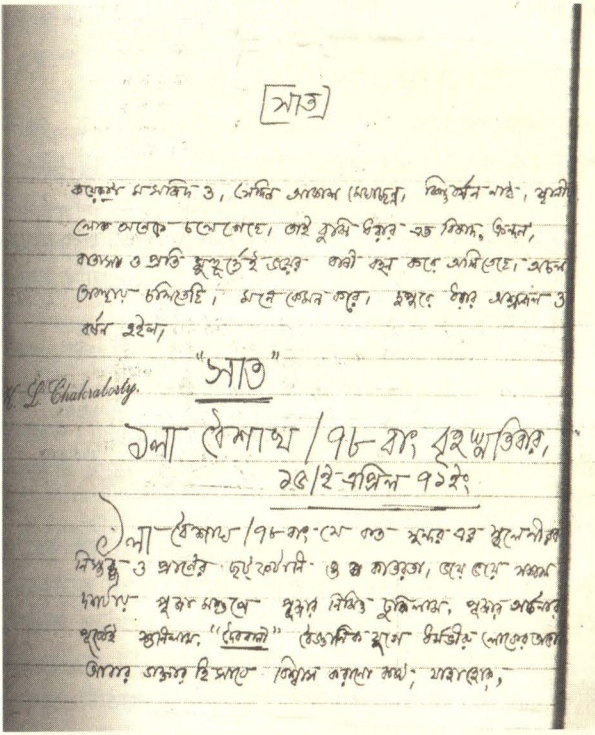

[সাত]

কয়েকটি সংবাদ ও, সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ছিন্নবৃন্ত পাতা, মৃত্যুর শোক অনেক চলে গেছে, তাই কুলি ধাঙর-এর বিনাশ, জীবন, বাতাস ও প্রতি মুহূর্তেই তাদের বন্দী হয়ে করে অভিনেছে। অচল অবস্থায় চলিতেছি, মনে কেমন করে, মুখরে ধার অসুখন ও বর্ষন হইনা,

"সাত"

K. L. Chakraborty.

১লা বৈশাখ / ৭৮ বাং বৃহস্পতিবার,
১৫/২ এপ্রিল ৭১ইং

১লা বৈশাখ / ৭৮ বাং সে কত সুন্দর এর মুলেশীর্ষ নিস্তব্ধ ও প্রাণের ছড়াছড়ি ও স্ব কাজরা, জেয় জেয় সকল মাটির পুরু মন্তরে পুরুর নিধি চুকিলাম, পুরুর অর্চনার থুকেই স্বাধীনতা "বেতনী" বৈজ্ঞানিক মুল ধর্মভীরু লোকের অন্তরে আমার অন্তর হিসাবে বিশ্বাস করলো সব; যারাহোক,

যাহারা ছিল তাহাদের নামের তালিকা দিলাম। আশ্রিতা অসহায়া ছাত্রী নমিতা সাহার সঙ্গে তার মায়ের বিগত তিন দিন হইতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আমিও আসিবার সময় তাহাকে আনিবার কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কিন্তু হঠাৎ হিরণ্ময় বলিলঃ 'তোমরা সবাই চলিয়া যাইতেছ, তাহাকেও নিয়া যাও।' আমি না করিলাম না, নমিতাও সাথী হইল। তার ছিল একটা ঝুড়ি, সাধারণ ২/১টা জামা, আয়না, চিরুনী। সেও চলিল।

নামের তালিকা

ক-বিভাগ

১) শ্রীকানাইলাল চক্রবর্ত্তী (নিজ)
২) শ্রীমতি দীপ্তি চক্রবর্ত্তী (স্ত্রী)
৩) মিষ্টি (বড় মেয়ে) ৫ বৎসর
৪) তাপস (বড় ছেলে) ৩ বৎসর
৫) আতস (ছোট ছেলে) ২.৫ বৎসর।

খ-বিভাগ

১। শ্রী অমিয় ভট্টাচার্য্য (ভগ্নিপতি)
২। শ্রীমতি বাসন্তী ভট্টাচার্য্য (দিদি)
৩। শিশির ভট্টাচার্য্য (ভাগিনা) ১০ বছর
৪। সৃষ্টি (ভাগিনী) ৪ বছর
৫। পঞ্চু (ভাগিনা) ১ বছর।

গ-বিভাগ

১। শ্রী হীরেন্দ্র কুমার দেব (নুনু জেঠা)
২। শ্রী দুলাল চৌধুরী।
৩। শ্রী মুকুল বিকাশ চৌধুরী (ঝুনা)
৪। শ্রী দিলীপ চৌধুরী
৫। শ্রী মাস্টার সন্তোষ বরণ নাথ
৬। শ্রী নমিতা সাহা।

ঘ-বিভাগ

১। শ্রী রমেশ চন্দ্র দে (মাখন বাবুর ভগ্নীপতি)
২। শ্রীমতি শিশুবালা দে (মাখন বাবুর ভগ্নী)
৩। দিলীপ (নুইন্যা) (মাখন বাবুর ভাগিনা ও শিশুবালার পুত্র)

ঙ-বিভাগ

১। মাখন লাল দে
২। শ্রীমতি প্রভা দে (মাখন বাবুর স্ত্রী)
৩। শিবু (ছেলে)
৪। শ্রীমতি বিদ্যাবালা দে (মাখন বাবুর শ্বাশুরী)

নিজের ছেলেমেয়েদের কে কোলে নিল তাহা মনে পড়িতেছে না। কারণ ছেলেমেয়েদের সব সময় হীরেন্দ্র, মাখন জেঠা, ঝুনা এরাই কোলে নিত। আবার ছেলেমেয়েরাও কখনও উক্ত নির্দিষ্ট মানুষের কোল ছাড়া হইতে চাহিত না। কাপড়-চোপড় কিছুই নিতে পরিলাম না। আমার পরনে গতদিনের একটা লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া সার্ট। বাঁশের উপর জুলানো পায়জামা, সার্ট এমনকি গামছা পর্যন্ত নিতে মনে নাই। স্ত্রী ছোট ছেলে আতসকে কোলে নিয়া ছুটিল। ছোট একটি বাকস তাহাতে ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণ জামাকাপড় ছিল, তাড়াতাড়ি টান দিয়া সেই বাক্সটি লইল। দুলা ও ঝুনার কোন মাল ছিল না, কিন্তু আমার নিজের তিন ছেলে মেয়ে ও ভাগিনা-ভাগিনী তিনজন, তাতে মোট পাঁচ জনই কোলের। এইভাবে বাহির হইতে প্রায় দশ/পনের মিনিট চলিয়া গেল। বোন বাঁশিদি ছোট কাঁদুনে ছেলে পঞ্চুকে কোলে নিল। তখন ছেলেমেয়েদের নিয়া যাইতে পথে কষ্ট হইবে বলিয়া হিরণ্ময় ও অমিয়বাবু আমাদের কিছু দূর আগাইয়া দেওয়ার জন্য সাথে চলিল।

ইতিমধ্যে সর্ত্ত অনুযায়ী জেঠা মাখন বাবু স্ত্রী-পুত্র-শ্বাশুরী এবং তাহার জিনিসপত্র লইয়া হাজির। গত রাত্রের আশ্রিত বিনোদ শুক্লদাস পুনঃ বাড়ী গিয়াছিল প্রাতে, আর তাহার দেখা নাই। আমার মা শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া আসিবেন না। বলিলেনঃ 'যদি অবস্থা খারাপ দেখি তবে লুকাইয়া থাকিব।' আর আছেন প্রতিবেশী দাদা

মনোরঞ্জন চৌধুরী। আসিবার সময় উক্ত চৌধুরী দাদাকে বলিয়া আসিলাম: 'আমার মাকে দেখিও'। তখনও তিনি সস্ত্রীক বাড়ীতে বসিয়া রেডিও শুনিতেছেন ও চা পান করিতেছেন। বাড়ীর ভিতর দিয়া টুকু চৌধুরীর খোলা জমি পার হইয়া কুমিরা বাজারের উত্তর অংশের বড় পুলের নিকটে সরকারী রাস্তায় উঠিলাম।

ইতিমধ্যে যক্ষ্মা হাসপাতালের দিকে, বঙ্গোপসাগরে ও দক্ষিণ দিকে অন্ধকার ও ধুয়াঁময়। আওয়াজে শরীর কাঁপিয়া উঠে। প্রথমে চোটেই হঠাৎ উপর্যুপুরি গুলি মহাবেগে আমাদের সামনে আসিয়া পড়িল, কিন্তু গত ২৬শে মার্চ, শুক্রবার রাত্রের মত বাঁচিয়া উঠিলাম। যাওয়ার সময় হীরেন্দ্র (নুনু) আমার মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল:'ঠানদিদি, আমি একটু পরে আসিব'। কই আর আসা, ছুটিলাম দলবলসহ।

যদি সেই দিন, সেই মুহূর্তে ঘরের বাহির না হইতাম, তবে সবাই পুড়িয়া মরিতাম। আর, আমার প্রতিশ্রুতিমত কুমিরা গ্রামে সেই দিন মুসলমান বলিতে ছিল না, সব 'ধ-য়ে আকার'।

বাজারের রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে ছুটিলাম। হাঁটিয়া চলিয়াছি, নিকৃষ্ট হাঁটার মধ্যে ভগ্নীপতি অমিয় বাবু ও দিদি বাসন্তি ভট্টাচার্য্য। ছোট কুমিরা পুলের নিকটে হঠাৎ চান মিয়া (Cat বলি)-র সঙ্গে দেখা। চান মিয়া অমিয় বাবুর কোল হইতে পঞ্চুকে কোলে নিয়া ছোট কুমিরা বাজারে আনিয়া অমিয়বাবু ও বাসন্তী ভট্টাচার্য্য দই জনকে একটি রিকসা বাঁশবাড়িয়া পর্যন্ত দুই মাইলের জন্য ঠিক করিয়া দিল। তখনও ছোট কুমিরা বাজারে অর্থাৎ মছজিদ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে গুলি আসিয়া পড়িতেছে।

আমরা হাঁটিতে শুরু করিলাম। পথে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। সবাইকে বলিতেছি: 'ছেলেমেয়েদের সীতাকুন্ডে রাখিয়া আমি চলিয়া আসিব।'

মছজিদ্যা মন্দিরের কাছে অনেক বন্ধু-বান্ধব তাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিবার জন্য অনুরোধ করিল, বিশেষ করে আমাদের যাত্রাদলের অভিনেতা মোহাং নূরল আলম (জুনু)। আমি তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র

ছিলাম। যাহা হোক, অনুরোধ পাশ কাটাইয়া বাঁশবাড়িয়া আসিয়া দেখি অমিয় বাবুরা আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে রাস্তার পাশে। আবার হাঁঠা শুরু করিলাম। তখনও গর্জন-তজন শোনা যাইতেছে ও ধুঁয়া দেখা যাইতেছে। কোনক্রমে বাড়বকুণ্ড স্কুল পার হইয়া কাঠগড় যাওয়ার রাস্তার মাথায় বটগাছের গোড়ায় বিশ্রামের নিমিত্ত বসিলাম, তাও খানিকক্ষণ, কারণ সেখানে অল্প বয়স্ক ছেলেরা বাস্তুহারাদের ইয়ারকি দিতেছে। আবার সাধারণ হাঁটিয়া শুকলালের হাটে বিশ্রাম করিলাম ও সস্তা দুইটা তরমুজ কিনিয়া ভাগ করিয়া খাইলাম।

আবার হাঁটার শুরু, কিছুদুর হাঁটিয়া ঢালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। অমিয়বাবু ও বাসন্তী ভট্টাচার্য্য দুইজন সীতাকুন্ড পর্যন্ত রিক্সা নিল। তখন হিরণ্ময় (টুন্টু) ও দুলাল চৌধুরী বাড়ীর অবস্থা দেখিবার মানসে ও মাকে আনিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী রওনা হইল। নিজ পকেট হইতে তাহাদের দুইটা দশ টাকার নোট দিলাম খরচ বাবদ। এদিকে ফেলে আসা সেই বিনোদ, তার ভাই, স্ত্রী ও মা সহ কিছু রিক্সায় মাল বোঝাই করিয়া বাড়বকুন্ডে কাঠগড়ের রাস্তায় নামিয়াছে। একটু পরে শুনি, সমুদ্রের চরে গুলি চলিতেছে। নৌকার উপরেও পাক সৈন্যরা গুলি চালাইতেছে।

আবার হাঁটা। এভাবে কোনদিন ছেলে কোলে নিয়া হাঁটি নাই। অথচ উপায় নাই। রাস্তার দুই ধারে শুধু আমাদেরই মত লোক চলিতেছে। সংখ্যা নাই, প্রশ্ন নাই। খাঁ-খাঁ রৌদ্র। রাস্তায় মাঝে মাঝে বাঙালী সৈন্যরা গাড়ী ও কামান লইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহারা টেলিফোনে এক অপরের সহিত যোগাযোগ করিতেছে। ছোটবেলায় দিয়াসলাইয়ের খালি বাক্সে সুতা দিয়া খেলনা টেলিফোন বানানোর কথা মনে জাগিল।

যখন সীতাকুন্ড বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিয়াছি, তখন বেলা দশটা। তখন পশ্চিমদিকে, সমুদ্রের চরের উপরে উড়োজাহাজ দেখিতেছি। সীতাকুণ্ড বাজারে মাত্র কয়েকজন লোক।

পূর্ব্ব রিক্সাযাত্রী দুই জন সীতাকুন্ড ওবাইদিয়া মাদ্রাসার বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছেন। সীতাকুণ্ডের অবস্থা কুমিরার মতই কাহিল

দেখিয়া পুনঃ হাঁটার শুরু। অল্প কতদুর আসিয়া উপরোক্ত খ বিভাগের মেম্বার শিশুবালা ও রমেশচন্দ্র দে তাহাদের ভাগিনা [শ্রীশ অধিকারীর] বাড়ীতে উঠিল। আমাদের সঙ্গে ঘ-দলের যোগাযোগ ছিন্ন হইল।

আরও কিছুদূর আসার পর দেখি, একটি ধুম-বাস দাঁড়ানো। অনেক প্রশ্নোত্তরে জানিলাম, বাসখানা কিছু দূর যাইবে। উঠিয়া বসিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত ড্রাইভার গাড়ি না ছাড়াতে যাত্রীরা বিরক্ত হইল।

এমনি সময়ে হঠাৎ কুমিরায় আমাদের পাশের বাড়ীর দাদা সুবোধ চৌধুরী দৌড়াইয়া বাসে উঠিলেন। সীতাকুন্ডে কোন কাজে গিয়াছিলেন। সেখানে নাকি উড়োজাহাজ হইতে মেশিনগান চালাইয়াছে। কল্পনা ছিল সীতাকুণ্ডে থাকিব। সীতাকুন্ড যখন থাকা গেল না তখন সন্তোষ বাবু অনুরোধ করিলেন, দারোগা হাটের পশ্চিমে তাঁহাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে। আবার সুবোধ বাবু বলিলেন, মিরেশ্বরাই তাঁহার বোনের বাড়ীতে উঠিতে। সুবোধ বাবুর কথা উপেক্ষা না করিয়া সন্তোষ বাবুকে নিয়াই একেবারে মিরেশ্বরাই তেজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। পাঠকের বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, সুবোধ চৌধুরী পরিবার পরিজন নিয়া মিরেশ্বরাই তাঁহার বোনের বাড়ী গিয়াছিলেন। মিরেশ্বরাইয়ের উপর বাস হইতে অবতরণ করিলাম।

এদিক পথে 'গ' বিভাগের দিলীপ চৌধুরী জাফরনগরে তার বোনের বাড়ীতে গিয়াছে। হীরেন্দ্রও হঠাৎ না বলিয়া বাস ছাড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্তেই সীতাকুণ্ডে এক বাড়ীতে তার ছোট ভাই দীপক ও ছোট বোন গীতাকে আনিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল, বাসা ছাড়িবার পূর্ব্বেই তার ভাইবোনের ব্যবস্থা করিয়া পুনঃ ফিরিয়া আসিতে পারিবে। হায়! হিরণ্ময়, দুলাল, দিলীপ ও হীরেন্দ্র চার জনেই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল! এখন কি উপায় হইবে?

যাহা হোক, মিরেশ্বরাই বাজারেও মুদির দোকান খোলা না থাকায় পয়সা থাকা সত্ত্বেও তিন জন শিশুর জন্য সাগুচিনি কিনিতে পারিলাম না। বাড়ী থেকে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাহির হওয়ার কুফল

শুরু হইল। কি করিব, কত রকমে যে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ঠকাইতে লাগিলাম তাহা লেখার অযোগ্য মনে করি। প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি রাস্তা। বিলের উপর দিয়া কোনাকুনি ছুটিলাম তেজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী।

তাহাদের বড় বাড়ী। অনেক লোক এক সঙ্গে যাইতেছি দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা আসিয়া আমাদের আগাইয়া লইয়া গেলেন, আমাদের বৈঠক দিলেন ও যথেষ্ট সমাদর করিলেন। ভাবনার অন্ত নাই। যে বাড়ীতে অনেক অনুরোধেও কখনও লইয়া যাইতে পারে নাই, সেই বাড়ীতে আজ বাস্তহারা হইয়া স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ আমাকে আশ্রয় নিতে হইল। পরম করুণাময়ের অপার মহিমার কথা কে বলিতে পারে?

কোন রকমে প্রথমে চা ও মুড়ি দিলেন। পুনঃ ব্রাহ্মণের পাক করার ব্যবস্থা হইল। প্রায় তিনটায় খাওয়া শেষ করিলাম। মাখন বাবুরা তেজেন্দ্রবাবুদের সাথে খাইতে গেল। তাহাদের নিজের লোক বেশী, তদুপরি পনের/বিশদিন পর্যন্ত চৌধুরী বাড়ীর প্রায় ১৭/১৮ জন ও আমরা ১৭/১৮ জন। তবুও কোন রকমে ব্যবস্থা করিলেন। তখনও সেই বাড়ীতে রেডিও বাজিতেছে, ছেলেপেলেদের সোরগোলও কমে নাই, কারণ তাহাদের মনে তখনও ভয়ের লেশমাত্র নাই।

প্রায় চারটার সময় সন্তোষ বাবু পুনঃ নিজ বাড়ীর দিকে ছুটিল। সঙ্গে আমি (লিখক স্বয়ং), ঝুনা (মুকুল) ও তেজেন্দ্র চৌধুরী। হঠাৎ অর্ধপথে হিরণ্ময় ও দুলালকে খালি হাতে ও বিরক্তিপূর্ণ মুখে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সবাই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সবাই উদগ্রীব হইয়া জমির আলীতে বসিলাম। হিরণ্ময় (টুন্টু) ও দুলাল মোটামুটি বলিল যে তাহারা কোন মতে বাড়বাকুণ্ডের অল্প দক্ষিণে আনেয়ারা জুট মিল এর নিকট হইতে ফেরৎ আসিয়াছে। আগুনের জন্য দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। আবার বলিতেছে, কুমিরা গ্রামে নাকি কিছুই নাই। মুহূর্তের মধ্যেই মা এর জন্য মন কত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হইল তাহা পাঠকবর্গের বুঝিতে বাকি নাই আশা করি।

যাহা হোক, এ অবস্থা কল্পনার বাহিরে। হায়রে, অন্তত নিজের ডাক্তারী সনদ এবং হিরণ্ময়ের সমস্ত সনদগুলির নকল কেন রাখিয়া আসিলাম? পূর্ব্বরাত্রে নোট খাতাটি হিরণ্ময়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এই কারণে যে সে বাড়ীতে থাকিবে এবং লোকের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তাহার জানার দরকার আছে। এখন মাকে হারাইলাম, আরও সে সমস্ত জিনিসপত্র হারাইলাম, যেমন, একটি দুই ব্যান্ডের ন্যাশনাল প্যানাসোনিক রেডিও, হারমোনিয়াম, দুইটা টাইপ মেশিন, পেট্রোমাক্স, সেলাই মেশিন, হাতবিদ্যার জিনিষপত্র, ডাক্তারী সমস্ত বই ও নোট, পিতৃদেবের ফটো ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই। তালিকা দেয়া বৃথা।

মুহূর্তের মধ্যে অন্য এক কথা মনে উঠিল এবং তাহা আমার জীবনের অত্যন্ত কষ্টদায়ক ঘটনা।

জীবনের প্রথম প্রান্তে একটা নেশার অভ্যাস ছিল। অবশ্য মদ, জুয়া বা গাঁজা নহে, আমার নেশা ছিল যাত্রা নাটক। অনেক বই (যাত্রা নাটক) বেশি দামে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তার পর আবার প্রতিটি বই হুবহু নকল করিয়াছিলাম। কোন সময় সারাদিন পরিশ্রম করার পর বই নকল করিতে রাত্রি কাটিয়া যাইত। একটি বাক্সে সমস্ত বই ও নকল ছিল। সবই বোধ হয় আগুনে শেষ করিয়াছে। এসব বইয়ের মধ্যে বাগদত্তা, সোহরাব রুস্তম, ঝড়ের দোলা, কোহিনূর, চন্ডীমঙ্গল, রাহুগ্রাস, দেবতার গ্রাস, আকালের দেশ, মধু মিলন, চাঁদের মেয়ে, জালিয়াৎ, চন্দ্রহাস ও সত্যের জয়-ই প্রধান।

রাস্তার উপরে কথাবার্তা শেষ করিয়া তাহাদের দুই জনকে তেজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী পাঠাইলাম। আমরা চারজন রাস্তায় উঠিতে যাইব, এমন সময় মিরেশ্বরাই বাজারে ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল। কয়েকটা মিলেটারীর গাড়ী তীর বেগে উত্তর দিকে চলিতেছে এবং রাস্তার দুই ধারে লোকজনকে বলিতেছে ও হাতে ইশারা করিতেছে: 'তোমার নিজেরা পালাও' ইত্যাদি।

কোথায় দোকানপাট, কোথায় রিক্সা, যে যেদিকে পারে দৌড়াইতেছে। সন্তোষ বাবু একটি পুটলী হাতে রাস্তার উপর

দাড়াইয়াছিলেন। আমরা সাগু খরিদ না করিয়াই পিছন দিকে পুনঃ ছুটিলাম ঝুনাসহ। তেজেন্দ্রবাবু কোথায় গেলেন সেদিকে দৃষ্টি নাই। অনেক দুর আসিয়া চোরের মত পিছন ফিরিয়া দেখি সন্তোষ বাবু ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ওনার স্বাস্থ্য ভাল, আমাদের সখের যাত্রা-নাটকে রাজার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করিতেন। আমাদের ধারণা, এইবার আমরা সন্তোষবাবুকে হারাইলাম, তিনি অনতিবিলম্বে পাঞ্জাবী সেনার আধার হইবেন [চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় 'আধার' শব্দের অর্থ 'ইতর প্রাণীর খাবার']।

পুনঃ আশ্রয়বাড়ীতে ফিরিলাম। সন্ধ্যা নিকট প্রায়। চা-এর নেশায় আমি ও শিশির কাহিল, কিন্তু বলিবার যোগাড় নাই, ক্রমে সন্ধ্যা সাতটার সময় নৈশভোজের ডাক আসিল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যায় তাহাদের বাড়ীতে নিত্য প্রথামত কীর্তন শুরু হইয়াছে। বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে ও সংকীর্তনের সুরে নিজেকে অতিষ্ঠ মনে করিলাম [অর্থাৎ 'অতিষ্ঠ হইয়া গেলাম']। তাহারা এখনও বাঘের থাবা দেখে নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের মনে এত উৎসাহ!

আহার শেষ করিয়া বৈঠকখানায় শুইতে গেলাম। তিন-চারটা চৌকিতে ঢালা বিছানা দিয়াছে। ঘুম নাই, মনে চিন্তা, বিশেষতঃ হীরেন্দ্রর (ননী) কথা মনে পড়িতে লাগিল। একটু তন্দ্রা আসিল, হঠাৎ হীরেন্দ্রর উচ্চ গলা যেন অনেক দুর হইতে শুনিতেছি। উঠিয়া বসিলাম। সে কোন রকমে রাত্রির অন্ধকারে আমাদের (আশ্রয়) বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে। এত দুঃখের মধ্যেও মনে একটু সুখের সঞ্চার হইল। সে আসিয়া অনেক কথাই বলাবলি করিতেছে, কিন্তু তখন নিদ্রা আমাকে গ্রাস করিয়াছে।

রাত সাড়ে বারোটায় হঠাৎ এক বিকট শব্দ হইল। অনুমান বোমার। কোন দিক হইতে বা কোথায় এই গুরুতর আওয়াজ হইল তাহা জানিতে পারিলাম না। সমস্ত গ্রামের লোকই দলে দলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘুম এখন আর তাহাদেরও নাই। কোন রকমে রাত্রি প্রভাত হইল।

১৭ই এপ্রিল/৭১ইং শনিবার; ৩রা বৈশাখ/৭৮বাংলা

প্রাতে উঠিয়া হীরেন্দ্রসহ আশ্রয়বাড়ীর সামনের বড় পুকুরে মুখ দুইবার নিমিত্ত গেলাম ও দেখিলাম, সরকারী রাস্তায় বাস্তুহারার দল হাঁটিয়া চলিয়াছে। আবার পূর্ব্ব দিকে দেখি, রেলের লাইনের পাশ দিয়া অন্য এক দল সুরসুর করিয়া সঙ্গে সাধারণ মালপত্র নিয়া উত্তর দিকে ছুটিয়াছে। আরও দেখিলাম, সামনে সরকারী রাস্তায় মিরেশ্বরাই বাজারের উত্তর অংশের বড় পুল ভাঙ্গা, চলাচলের জো নাই। তখন ইহাকেই রাত্রের বিকট শব্দের ফলস্বরূপ বলিয়া মনে হইল। আরও দেখিলাম, জাফরনগর হইতে আমাদের আশ্রয়বাড়ীর আত্মীয়রাও আসিতেছে। এই গ্রামেরও অনেক লোক প্রাণভয়ে মালপত্র নিয়া ছুটিতেছে, অনির্দিষ্ট পথে, যদিও সেখানে তখনও পাক সেনারা অত্যাচার শুরু করে নাই। অনেক চিন্তা করিয়াও কোন ফল হইল না।

১৫/২০ মিনিট পর সুবোধ বাবু ও অন্যান্য সহযোগীর তাগিদে আমরাও হাঁটা শুরু করিলাম। কোথায় চা ও পান খাওয়া, ছুটিলাম রেল লাইনের পাশ দিয়। রৌদ্রে, জলপিপাসায় সবাই অস্থির। ২/১টা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া দেখিলাম প্ল্যাটফর্ম শূন্য ও চারিদিক খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাস্তুহারারাই আজ ভীড় জমাইয়াছে চারিদিকে। পথে চৌধুরী বাড়ীর একটা বড় পুটলি কিভাবে যেন খুলিয়া পড়িয়া গেল। দেখি, চৈত্র-সংক্রান্তীর কিছু 'চিড়া-মুড়ি' ও 'লাড়ু-লাবণ'। কুড়াইতে গিয়ে একটা মুখে দিলাম। মেয়ে মিষ্টি কাঁধে ছিল, তাহার কথা স্মরণ নাই। হঠাৎ 'বাবা' শব্দে টনক নড়িল, তাহাকেও এক কামড় দিতে হইল। মেয়ে সেই অংশ খাওয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্তটা শেষ করিয়া দিয়াছি।

ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলে তাপস তাহার দাদা অর্থাৎ আমার মাখন জেঠার কাঁধে চড়িয়া চলিতেছে ও রবি ঠাকুরের পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট মেয়ে মিনির মতই অনবরত প্রশ্ন করিতেছে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই বোকাকে তার দাদা বুঝ দিয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য আজ কোথায়?

একটা ষ্টেশন মাস্তান নগরে (আগে নামছিল জোরারগঞ্জ) থামিয়া ছেলেদের মাথায় জল ছিলাম। রেলের পুলের নীচের খোলা জল খাইলাম ও ছেলেমেয়েদের খাওয়াইলাম। মিরেশ্বরাই হইতে যে সাগুর বোতল চাহিয়া আনিয়াছিলাম তাহা ষ্টেশনের সিমেন্টের দাওয়ায় পড়িয়া ভাঙ্গাইয়া গেল। বিপদ হইতে দেরী নাই।

আবার চল, চল, কিন্তু কেহই উঠিতেছে না। আমরা সবাই আরামপ্রিয় ছিলাম, কখনও বড় রাস্তা ও রিক্সা ছাড়া চলি নাই, তবুও উঠিলাম। আমাদের প্রত্যেকের কোলে-কাঁধে ছেলে-মেয়ে একটা না একটা আছে।

পূর্বের অধ্যায়ের হাঁটার অযোগ্য যাত্রী দুই জন, অমিয়বাবু ও বাসন্তী ভট্টাচার্য্যকে লইয়া আবার ঠেকা। তাহারা আমাকে নানা রূপ দোষারূপ করিতে লাগিল: 'পাঞ্জাবীর গুলিতে প্রাণ দেওয়াই ভাল ছিল। আর হাঁটিতে পারিব না, তোমরা চলিয়া যাও' ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের সেই কথা শোনার সময় বা ইচ্ছা কাহারও নাই।

ছোট ছেলেদের চেহারা কেমন ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে চলিল তাহা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। রাস্তায় ক্ষিধা ও পিপাসার জ্বালা মেটানোর মত কিছুই দেখিতেছি না। হঠাৎ রেলের লাইনের পাশে একজনের নিকট হইতে কয়েকটি খিড়া (তাও ক্ষেতের শেষ অংশ) বারো আনা দিয়া কিনিয়া নিলাম। ভাগ করিয়া কোন রকমে চলিতে চলিতে খাইয়া শেষ করিলাম। যে খিড়া ছেলেমেয়েদের অসুখ হইবে বলিয়া কোনদিন মুখে দিতে দিই নাই, আজ সেই খিড়া খোসা না ছাড়াইয়া বাকলসহ নিজেই খাইয়া বসিলাম।

রৌদ্রের মধ্যে কোন রকম বারৈয়ার হাট ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইলাম। সাধারণ চা ও মুড়ি জুটিল। এখান থেকে শুভপুর ব্রিজ পর্যন্ত রিক্সায় ভাড়া ছয় টাকা। এত ভাড়া কিভাবে সম্ভব? পাঠক বর্গ, রিক্সাভাড়া ছয় টাকা হইলে রাস্তার দুরত্ব অনুমান করিতে পারেন।

আবার হাঁটিতে শুরু করিলাম। ছয় টাকা দিয়া একটা রিক্সা ভাড়া নিয়া উক্ত যাত্রী (বোন ও ভগ্নীপতি) দুইজনকে রিক্সায় তুলিয়া দিলাম। অন্য সবাই হাঁটিয়া চলিলাম। দুই-মাইলের মত হাঁটিবার

পর কোলের-কাঁধের ছোট ছেলেদের প্রতি মনে ক্রমে বিরক্তির সঞ্চার হইল। গ্রুপ ভাগে নিজের ভাড়ায় তখন প্রতিটি চার টাকা হিসাবে ২/১টা রিক্সা ভাড়া নিলাম। কোন রকমে শুভপুর ব্রিজের নিকট আনিয়া দিল। ক্রমে সবাই জমাট [একত্রিত] হইলাম। সীতাকুন্ড ও অন্যান্য জায়গার আরও কয়েকজন লোকও দেখিলাম সেখানে।

অনেক কষ্টে নদীটা প্রস্থে পার হইলাম। নদীপথে দেখি আমাদের নিজ গ্রামের কবিরাজ সুরেন্দ্র ঠাকুরের ছোট ছেলে রাখাল শর্মা (কাবুলিওয়ালার দালাল মোদক বিক্রেতা ও প্রতারক)। ইশারাতে সেই রাখাল কি বলিল তাহা শুনি নাই। আমরা কয়েক বার তাহাকে বলিলাম, 'তোমার বাবা মারা গিয়াছে।'

তীরে উঠিয়া আবার সাধারণ কিছু হাঁটিয়া দেখি একটা ট্রাক (লরি) আসিয়া হাজির। ছাগলের মত লোক ভর্তি হইল এবং ভাড়া জনপ্রতি আট আনা হিসাবে দেওয়া হইল। রাস্তা ২/৩ মাইলের বেশী হবে না। ট্রাক আসিয়া গন্তব্যে দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি স্বল্প হাঁটিয়া ত্রিভুজাকৃতির ভারত-সীমান্ত চিহ্ন পার হইয়া একটু ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, পেছনে অনেক যাত্রী। যাক, আর পাকসেনার ভয় নাই। হঠাৎ গুলি চালাইলেও আমাদের পেছনের লোকেরা মারা যাইবে। লোকমুখে শুনিলাম, এই জায়গার নাম 'শ্রীনগর সীমান্ত'।

বড় একটা বাজার, অফিস ও থানা দেখিলাম। কেহ কোন প্রশ্ন করে না। দেখি, আমাদের আগে কুমিরার আরও কয়েকজন আসিয়া পৌছিয়াছে। কাহাকেও কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নাই। দরকার মৃতপ্রায় শিশুদের বিশ্রামের। ছায়াশীতল গাছের নীচে সবাই বিশ্রাম করিল। কিন্তু ঠাকুরের নাম, বাপের নাম, কাজ-কর্ম ও বিশ্রাম কিছুই ভাল লাগে না। 'চা', 'চা'- সবার মুখে একটাই শব্দ।

—

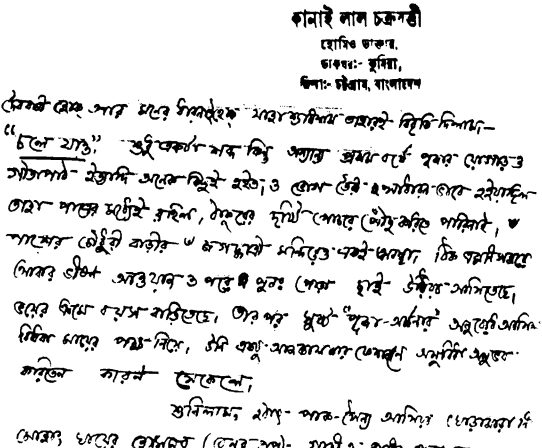
কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার,
ডাকঘর:- কুমিল্লা,
জিলা:- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

(মূল লেখার তারিখ: ৬/৮/৭১; ১ PM অনুলিপি: ২২/১২/৭১; ৭ PM)

রচনাকালীন বা অনুলিপি করাকালীন টীকা: আজ শুক্রবার রাখী-পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ। অন্যান্য বছর এমন দিনে ছেলেমেয়েদের হাতে রাখী উঠেছে। আজ ছেলেদ্বয় পালিয়েছে। অভাগা মেয়েটিকে একটি রাখী দিবার ক্ষমতাও আমার নাই। থাক সে কথা।

চার। শ্রীনগর

শ্রীনগরে দোকানপাট অনেক আছে, কিন্তু আমাদের প্রতি স্থানীয় লোকজনের সহানুভুতি তেমন নাই। পাকিস্তানী পয়সাতে কোন মাল বিক্রি করিবে না। প্রথমে ছেলের কান্নাকাটি সহ্য করিতে না পারিয়া প্রকৃত মুল্য পনের পয়সার স্থলে পাকিস্তানী ত্রিশ পয়সা দিয়া মাত্র একটা চেপটা (রোজ) বিস্কুট নিয়া তিন টুকরা করিয়া তিনজনকে দিলাম। ইহাতে যে ভীমরুলের মৌচাকে ঢিল সংযোজন করিলাম তাহা পিতামাতা ভিন্ন স্বয়ং ভগবানেরও বুঝিবার সাধ্য নাই। খুঁজিতে লাগিলাম, কিভাবে টাকা পরিবর্তন করা যায়। নেপাল বিশ্বাসের নিকট হইতে চারিটি পাক টাকা দিয়া দুটি ভারতীয় টাকা নিলাম। ক্রমে কিভাবে আরও ২/৩ টাকা সংগ্রহ করিলাম মনে নাই। লোক প্রায় ৩০/৩৫ জন আমরা, রান্নার কোন তৈজসপত্র নাই। লোকে লোকারণ্য। অনেক অনুরোধের পর এক ভদ্রলোক তাঁর ছোট এক কামরায় স্থান দিল। গরু ঘরের দাওয়ায় পুরানো হাড়িতে খিচুড়ি তৈয়ারী হল। তখন 'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি'। কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া, কঞ্চির আঁটি জ্বালাইয়া এক পাতায় ৩ জন হিসাবে ব্রাহ্মণ-শুদ্রের ভেদ না রাখিয়া অর্ধভোজনেই উঠিয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার পর শীতও মনে হইতেছে, প্রত্যেকেরই পা ফুলা, রাত্রে শুইবার জায়গা নাই। একটি 'কুইজ্যাতলে' (খড়ের গাদার নীচে) শুকনা খড়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মাখন জেঠা উঠিয়া বসিল। দেখিল, একটা বেশ 'দাড়িগোঁফ' ওয়ালা (পাঞ্জাবীর মত) ছাগল তাহার মাথায় প্রস্রাব করিয়াছে ও কিছু ছাগলাদ্য বটিকাও দিয়াছে। উপায় নাই, দুর, দুর করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চোখ খুলিয়া দেখি প্রভাত। (লেখার তারিখ: ৬/৮/৭১; ৯ AM)

পাঁচঃ মনু বাজার

অচেনা ও অনির্দিষ্ট পথে সকালে প্রাতরাশ না সারিয়াই সুবোধ বাবুর পরিচালনায় রওনা হইলাম। পাহাড়ের রাস্তা, কত উঠানামা ও কঙ্কর-ধূলাময়। ভীষণ রাস্তা, শুনিলাম 'বার' মাইল। কয়েকটা জীপ ও ট্রাক চলাচল করিতেছে, কিন্তু একটু জায়গাও নাই কোন গাড়িতে। তদুপরি ছোট বাচ্চাকাচ্ছা নিয়া জীপের পরিবর্তে হাঁটিয়াই চলিলাম। চলিলাম শুধু মনের জোরে এবং সকালে কিছু না খাইয়া। পুর্ব্বের রাত্রে অর্ধভোজন করিয়া পরদিন হাঁটার গতি কি রকম হইতে পারে পাঠকের অনুমেয়। যাহা হোক, প্রথম ঘণ্টা খানেক চলার পর পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই 'বার মাইল', 'আট মাইল' ইত্যাদি। আগে ও পিছে অনেক চলিয়াছে। কিন্তু যোগাযোগ নাই কারও সাথে কারও।

পথে কুমিরার রাখাল ও নেপাল মিস্ত্রীও ছিল। চলার পথে একটু বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, কারণ আমাদের সবাইর কোলে ছেলে বা মেয়ে, তাই হাঁটিতে কষ্ট। পূর্বে উল্লেখিত ভগ্নী ও ভগ্নীপতি দুইজন মৃতপ্রায়। সবার চেহারা যে কত ম্লান হইয়াছে তাহা যদি 'পাতাল ভৈরবী' ছায়াছবি দেখিয়া থাকেন, তবে 'রামুর' চলার কথা স্মরণ করেন।

চৌধুরী বাড়ীর সবাই আগে বিশ্রাম পেয়েছেন এবং আমরা বিশ্রাম পাই নাই। তাই তাহারা একটু আগাইয়া বিশ্রাম করিতে পারেন, আমরা পিছনে পড়িয়া থাকি। অর্ধপথে পাহাড়ের উপর একটা চায়ের দোকান দেখিলাম, খুবই ভীড়, কোনক্রমে ২/৩ কাপ চা পান করিয়া পুনঃ রওনা হইলাম। দীর্ঘ পথে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, তদুপরি পথে দোকানীরা পাকিস্তানী পয়সা বাটা দিয়াও নিতে চায় না।

সেই দীর্ঘ পথের অনেক ঘটনাই মনে নাই। যত দূর মনে পড়ে, প্রায় যখন চলিয়া আসিয়াছি, আর হাঁটিতে পারি না, তখন একটা ট্রাকে করিয়া চলৎশক্তিরহিত বোন ও ভগ্নীপতিকে পাঠাইয়াছিলাম।

সর্ব শেষে আমি নিজে, মাখন জেঠা এবং তাহার শ্বাশুড়ীসহ কাছাকাছি এক দোকানে সাগু খরিদ করিয়া কোনক্রমে গরম করিয়া লইয়া গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়া মনুবাজারে পৌছিয়াছিলান।

তখন আমারও চলৎশক্তি রহিত। তখন বেলা প্রায় দুইটা। হীরেন্দ্র আসিয়া 'বর্ডার স্লিপ' হাতে দিল। এক কার্ডে ১১ (এগার) জন। মাখন বাবুদের ও চৌধুরী বাড়ীদেরও পৃথক পৃথক কার্ড হইল। এরপর হীরেন্দ্র আমাদের ডাকিয়া মনুবাজার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লইয়া গেল। সেখানেও ভীড়।

কিছুক্ষণের মধ্যে রেশনও হীরেন্দ্র নিয়া আসিল, কিন্তু রান্না করার সরঞ্জাম কই? দেশের মৃত্যুঞ্জয় ও মাখন জেঠা দুইটা থালা কিনিল এবং হিরণ্ময় একটি সিলভারের ডেক্সি কিনিল। চৌধুরীরাও কিছু কিছু বাসনপত্র কিনিল।

থাকার ব্যবস্থা ঠিক হইল অনেক ঝগড়ার পর। স্কুলের বিজ্ঞান কক্ষে ৮/৯ পরিবার এক সাথে। এখানে স্বার্থপরতা শুরু হইল। যারা ঝামেলার লোক তারাই বেশি জায়গা দখল করিল। আমরা ভিতরে মেয়েদের ব্যবস্থা করিয়া পুরুষেরা বাহিরের বারান্দায় প্রস্থভাবে শোয়ার জায়গা করিলাম। রাত কোন রকমে কাটিল।

বি.দ্রঃ ১৯শে এপ্রিল হইতে ৭ই মে পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনা লিখিতেছি।

১৯শে এপ্রিল, ৭১ ইং; ৫ই বৈশাখ, ৭৮ বাংলা, সোমবার

কি করিব, তাহা ঠিক করিতে পারি না, টিউব ওয়েল আছে, মাঠে রান্না চলিতেছে। কদলীপত্র ও লাকড়ীর অভাব নাই। পাহাড় হইতে লাকড়ী কাটিয়া আনি। তাহা ছাড়া ছোটদের সাগু, বার্লি ইত্যাদি আরও তৈজসপত্রও কিনিতেছি। ভাংতি পয়সার অভাব, তবে চুরি নাই। জিনিষপত্রের দাম বেশী।

আত্মীয়দের নিকট প্রাথমিক সাহায্য চাহিতে হইবে, কারণ রিক্তহস্ত। হঠাৎ মনে হইল, আগরতলায় নরসিংগড়ে আমার দেশের দেবেন্দ্র কাকা বাড়ী করিয়াছেন। যদি কোন ক্রমে তার কাছে যাই হয়তঃ পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া সাহায্য পাইতে

পারি। এক কথায় ভিক্ষায় বাহির হইলাম। সংগে রাখাল মিস্ত্রীও যাইবে।

রাখাল মিস্ত্রীসহ জীপে উঠিলাম। পয়সা কিভাবে যোগাড় হইল তাহা আর লিখা হইল না। আগরতলা যাওয়ার পথে বিশ্রামগঞ্জ নামক এক জায়গায় পৌঁছার পর ঝড়-তুফান শুরু হইল। জীপ খারাপ হওয়ার দরুণ একটু অপেক্ষা করায় এক লোকের সঙ্গে আলাপ। উক্ত লোকের নিকট দেবেন্দ্র দত্তের (বর্তমান নামঃ ধীরেন্দ্র দত্ত P.W.D) বাড়ির ঠিকানা ভালভাবে জানিয়া নিলাম।

১২২ মাইল পথ পার হইয়া আগরতলা শহরে পৌঁছিলাম, তথা হইতে রিক্সায় 'কামান চৌমুহনী' গিয়া ৪নং বাসে উঠিয়া নরসিংগড় নামিলাম ও দেবেন্দ্র কাকার বাসায় পৌঁছিলাম।

কাকীমা চিনে না। চৌদ্দ বৎসর আগে তাহারা ভারতে আসিয়াছে। কাকা আসিয়া দুঃখ করিল, কেন তোমার মাকে আনিলে না ইত্যাদি। তাদের বর্তমান অবস্থা ভাল, আগের কথা সবই ভুলে যাবারই কথা। অবশ্য আদরযত্ন মন্দ নয়, রান্না করিয়া রাত্রে খাওয়া হইল। গল্পের পর রাত কাটিল। সকালে চা খাওয়ার পর দশটি টাকা দিয়া বিদায় করিল। টাকা না আনিলে মনে কষ্ট পাইবে, তাই আনিলাম।

বিকাল চারটায় ২০/৪/৭১ইং মনুবাজার ফেরত আসিলাম, আসিবার সময় আগরতলায় নিজ হাতের আংটি ৩১ (একত্রিশ) টাকায় বিক্রি করিলাম। জীপ ভাড়া ও বাস ইত্যাদিতে মোট ২০/২২ টাকা খরচ হইয়া গেল।

মনুবাজারে রেশান প্রতিদিন নিতে হয়। তবে কষ্ট আমার নিজের তেমন নাই। সব কাজই লোকেরা করিতেছে। আমার কয়েক দিন পানের পয়সা জুটে নাই। পান খাইতে না পারিয়া ২/৩ দিন বাজে বিড়িও টানিয়াছি।

ইতিমধ্যে মনস্থ করিলাম, সাধারণ ব্যবসা করিব। আমরা শ্রীনগর হইতে মনুবাজার আসিবার পথে খাবারের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। এই পথে সাধারণ খাবার বিক্রি করিলে লোকেরও সুবিধা হইবে, কিছু পয়সাও আয় হইবে। টুন্টু ও ঝুনাকে লইয়া বাজার

করিলাম। লাল আলু, চনাবুট, লজেন্স, বিড়ি, সিগারেট ও মেচ লইয়া শ্রী নগরের পথে ২/৩ মাইল হাঁটিয়া গিয়া এক ছড়া'র (নদী) নিকটে (যাহাতে জলের সুবিধা হয়) বসিয়া বিক্রী করিল। এইভাবে ৩/৪ দিন ব্যবসা করিয়া আমার (মূলধন) আমাকে ফেরৎ দিয়া ১৫/২০ টাকা লভ্যাংশ যোগাড় করিল। তাহারা এই টাকা দিয়া পুনঃ বাড়ীতে (দেশে) গিয়া দেশের অবস্থা বুঝিবার জন্য ও আমার মাকে নিয়া আসিবার জন্য আলোচনা করিতেছে। এই ২/৩ দিনের মধ্যে আরও অনেকে আমাদের মত ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল।

তার পর একদিন বুধবার হিরণ্ময়, ঝুনা ও ননাই (দীপক দাশ) রামগড় বর্ডার হইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। পথে হারুয়ালছড়ি (ফটিকছড়ি থানা) নিবাসী মাসতুতো বোনের জামাই ডাঃ হরিহর চক্রবর্তীর সঙ্গে হিরণ্ময়ের দেখা। কথোপকথনের পর একটি পাটী আমার ছেলেমেয়েদের জন্য 'গ' বিভাগের দিলীপকে দিয়া পাঠাইয়া দিল। উক্ত দিলীপ জাফরনগর হইতে প্রতিবেশী বিমল চৌধুরী (টুকু চৌঃ)-র সঙ্গে হরিণাতে আসিয়াছিল, পরে তাহার ভাই প্রণব (ধনা)-কে নিয়া মনুবাজার আসিয়াছে। দিলীপের পরণে আমাদের মতই এক লুঙ্গি ও এক সার্ট, প্রণবেরও একই অবস্থা। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া চৌধুরী বাড়ীর সাথে চলিতেছে।

দিন যায়। কি করিব, না করিব ঠিক নাই। ইতিমধ্যে ২২/৪/৭১ ইং বৃহস্পতিবার ছোট কুমিরার বিশিষ্ট সঙ্গী ও বন্ধু অমলের দেখা। সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিয়া বাসে আগরতলা যাইতেছে। বাস দাঁড়ানো অবস্থায় ২/৩ মিনিট তাহার সহিত কথা বলিলাম। কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ 'কানাই' শব্দ উচ্চারণে বাসের ভিতর হইতে আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে ডাকিলেন। সময় খুবই কম, বিশেষ কিছু কথা হইল না। শুধু উদয়পুর যাইতেছেন, পরদিন দেশে ফিরিবেন, এই বলিলেন। আমি বলিলাম, আগামী কাল যাওয়ার সময় যে কোন প্রকারে এখানে (অর্থাৎ মনুবাজার স্কুলের বারান্দায়) একবার আসিবেন।

এদিকে মনুবাজারে ২/১ জন স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হইতেছে। ২/১ জন রোগীপত্র আর যৎসামান্য পয়সাও পাইতেছি। কিন্তু মন খারাপ, ভবিষ্যতে কি হইবে? ইতিমধ্যে দেশের অনেক লোক এই কেম্পে আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া শৈলেন বাবু, রাজেন্দ্র (সুফী), বিমল (বেঙ), বালক সাধু (দুলাল শীল), পরেশ নাথ, মামা সুমন্ত, মছজিদ্যা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সতীন্দ্র বিশ্বাস। আবার শৈলেন বাবুর সঙ্গে খ বিভাগের রমেশ চন্দ্র, চা-দোকানী ধীরেন্দ্র (কাশ), সারদা ও কালাবুড়ী প্রভৃতি। ছোট কুমিরার আমার পুরোনো গ্রাহক হিমাংশু শীলও আসিয়া হাজির। এইভাবে কোন ক্রমে চলিতেছে। চিঠি বা আত্মীয়দের ভিক্ষার আশায় শকুনের মত বসিয়া আছি। বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার এগার দিন পর ছড়াতে স্নান করি। কাপড়-চোপড় কিছুই নাই।

তিনটা নিকৃষ্ট দোকান ঠিক করিলাম। একটা চায়ের দোকান, একটা ষ্টেশনারী বা (টং দোকান) আর একটা বাজে মালের দোকান। এতই যখন লিখিলাম, তখন দোকানের বাখানও কিছু লিখি না কেন।

চায়ের দোকান

দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৪x৪ হাত, একটা বেঞ্চ, কিছু বিস্কুট একটি ঠোংগায় থাকে। দোকানদারের চেহারা দেখিতে একটা তক্ষকের (গিরগিটি) মতো। ডান হাত ভাঙ্গা, গরীব ও অশিক্ষিত। কিন্তু মুখে মধু। এই রকম অশিক্ষিতেরাই সব সময় ভগবানের করুণা পাইয়া থাকে। দোকানদারের নাম 'বেচু'। কেন যে আমার প্রতি বেচুর মন টলিল তাহা জানি না। চা প্রতি কাপ ১৫ (পনের) নয়া, কিন্তু ডাক্তার বাবুর নাম বলিয়া পাঠক, আপনিও চা খাইয়া আসিতে পারেন। এতদুর আসিয়াও যে দেশের মত সম্মান পাইলাম, তাহার জন্য বেচুকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই।

টং দোকান

দোকানটি মনুবাজার স্কুলের সামনে। দোকানদারের নাম যতীন্দ্র দত্ত। খুবই ভাল লোক, ওনার কাছে যে সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি পেয়েছি তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

বাজে মালের দোকান

দোকানদার ভাল, কিন্তু ভাংতি পয়সার অভাব, বাজার করিলে টাকা পুরাইয়া করিতে হইবে। না হয় টাকা জমা দিয়া আসিতে হইবে। তবে বাকীও দিবে।

এদিকে ঝুনা ও হিরণ্ময়কে বাড়ী যাইতে দিবার জন্য ডাঃ প্রবোধ চৌধুরী (লেদদা) পরোক্ষভাবে আমাকে দোষারোপ করিতেন। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করা ছাড়া আর আমার হাতে কি ছিল?

চিঠি ও টিএমও

কোনক্রমে দিনে দুইবার ডাকঘরে হাঁটাহাঁটি করিয়া স্থানীয় সাক্ষী যোগাড় করিয়া প্রথম দিনে (৫০+৫০)=১০০ একশত টাকা টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার গ্রহণ করিলাম।

আমার বাল্য বন্ধু ব্রজেন্দ্র সাহা (বটু) লামডিং হইতে লিখিল:

প্রিয় বিদেশ,

তোদের আসার সংবাদে আশ্বস্ত হইলাম, আপাতত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম। এই টাকা পাইয়া বসিয়া না থাকিয়া এই দিকে চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিস। শুনিলাম, ধর্মনগর হইতে ট্রেনভাড়া ফ্রি। আমি ভাল, ভালবাসা নিবি। ইতি,

বটু।

যাদবপুর হইতে মামা অমৃত বাবুর চিঠি পেলাম। চিঠির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইল:

২০৩

"তাপস" K. L. Chakrabarty

মনে উঠিল, "বন্ধুর কাছে টাকা চুরিবার পূর্ব্বে তোমরে জিজ্ঞাসিতে, তোমার বন্ধুর দরকার বেশী, না টাকার?" চাহিবামাত্রই পাইব আশা আছে, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞাসিলাম না, মনে মনে ঘটনা ঘটিল, কিন্তু বাহিরিয়া "সা-বৌকে" ও কহিলাম, বলিতে কেবল মাত্র বন্ধুর নিকট হইতে ২০ (বিশ) পয়সা হস্তগত করিলাম, পাঠাবার ঠিকানার জন্য, তেই বিশ পয়সা আমার হাতেই রহিল, চা-খাওয়ার পোষায় গেল, কেবল বাসায় (মেসে) ফিরিবার জন্য আমিজ কিনে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত নাগিয়া উঠিলাম, পথে "অফিস" নামে একটা "চা-ঘরের" দোকান, তার সামনে একটা "টিউব-ওয়েল" কেবলই তাহাতে ভে মিয়ে সকে বন্ধ দেখিলাম, পুনঃ পুনঃ দেখা, কেবলই বই বাড়িয়া সান্ত্বনা দিলাম, যদি বেশী-দিনের মতোর হয় তবে মন ভাইয়া, দিনি বিদায় হইল, অবিলম্বে পথে "আমার-আমেন" নর দিকে ফিরিয়া হইতে উপস্থিত "উপস্থিত" "কানাই" ডাক শুনিয়া ফিরিতে বলে গেলিবা, ফিরিয়া তাহাকে হাতে দিয়া পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি করে চলিলাম।

K. L. Chakrabarty.

কল্যাণীয় বিদেশ,
আশীষ নিও। তোমার মাকে আনিলে না কেন? রিফুজি কার্ড ভিন্ন ভিন্ন করাইও। তোমার জেঠার নিকটও পত্র দিয়াছি। আপাততঃ ৫০ টাকা পাঠাইলাম, ধীর স্থির মস্তিষ্কে কাজ করিও। কেম্পে ডাক্তারী করার ব্যবস্থা করিও। যে কোন অবস্থায় কেম্প ছাড়া হইও না। তাহা হইলে ভবিষ্যতে Settlement হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমি কাজে ব্যস্ত। এখানে পার্টীগত (নকশাল/কংগ্রেস, সম্পাদক) গোলমাল বেশী। কত দুর অগ্রসর হয় জানাইও। ইতি
আর্শীবাদক,
তোমারই মেজ মামা

২/৩ বৎসর আগে পর্যন্ত চলিয়া আসিবার জন্য বড় মাসী (চন্দন নগর) খুব লিখিতেছিলেন। এখন বড় মাসীর কোন জবাব নাই কেন? মনে ক্রমে অশান্তি বাড়িতে লাগিল। ত্রিপুরা, মনুবাজারের আবহাওয়া ঠিক আমাদের দেশের মতই। মাঠে রান্না হয়, সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন রান্না করা হয় না, হয়ত মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি খাই। কিন্তু ঘুমাইবার ভীষণ কষ্ট। অনেক রাত্রে বৃষ্টির দরুণ বসিয়া থাকি। একদিন বাহিরে শুইয়া আছি, অর্ধরাত্রে হঠাৎ খুবই বৃষ্টি আসিল। ১৮/৪/৭১ইং হইতে আজ ৭/৮/৭১ ইং পর্যন্ত মাথায় বালিশ নাই। পায়ের চাপ্পাল (Chappal) জুতা মাথায় দিয়া গায়ের চাদর গায়ে দিয়া শুই। এক মধ্য রাত্রে জাগরিত হইয়া দেখি বৃষ্টিতে আমার পায়ের দিকে ভিজিয়া গিয়াছে। একটু তন্দ্রাও আছে, হঠাৎ পায়ের তলায় বালিশের মত মনে হইল। লক্ষ্য করিলাম, একটা কুকুর আমার চাদরের নীচে। কুকুরটিকে তাড়াইয়া দিয়া পুনঃ চিন্তা করিতেছি, সেও বোধ হয় পাক-সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত কোন শরণার্থী কুকুর হইবে। সকালে দেখি, আমার চাদরে কতকগুলি (কুকুরের) কেশ লাগিয়া আছে।

যাহা হোক, এভাবে ১৭/১৮ রাত্রি যেভাবে কাটাইলাম তাহা লিখার প্রয়োজন মনে করি না। এদিকে ছেলেমেয়ের জন্য সাধারণ যাহা ঔষধ বাড়ী হইতে আসার সময় আনিয়া ছিলাম তাহাও শেষ

প্রায়, টাকা পাওয়ার পর ২/১টা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করিলাম: সিলভারের কলস, বিছানার চাদর (ছোট), ২/১ টা সাগুর বোতল, শিশিরের প্যান্ট, একটি দাও (কাটারী) ইত্যাদি। রেশনের চাউল জমা থাকে, অন্যান্য সব জিনিষই কিনিতে হয়। এদিকে পোস্টকার্ড ও খাম কিনিতেই অনেক পয়সা ব্যয় হইতে লাগিল।

হীরেন্দ্রের ছোট ভাই দীপক ও ছোট বোন গীতা অসিয়াছে। আমরা সবাই এক সাথে খাওয়া চালাইতেছি। 'গ' বিভাগের নমিতা সাহা অনেক কাজ করিতেছে অর্থাৎ আমাদের সাহায্য করিতেছে। বিশেষতঃ তাপস ও আতসের দেখার ভার সেই চালাইয়া নিতে লাগিল, ছেলেমেয়ের স্নান, পায়খানা, প্রস্রাবের দায়িত্বও তার হাতে।

এদিকে রব (হুজুগ) উঠিল, রেশন ৪/৫ মাইল দূরে কলাছড়া হইতে আনিতে হইবে ইত্যাদি। অবশ্য পায়খানা প্রস্রাব ও স্নানের তেমন সুবিধা এখানে নাই। কিছু দুরেই একটা নদী (ছড়া)। অনেক সময় সেইখানেই স্নান করিতাম।

একদিন সন্ধ্যায় নিজে রেশানের জন্য গিয়াছি। এমন সময় খবর গেল, ঝুনা (মুকুল) আসিয়াছে। সে এবং হিরণ্ময় দশ/এগার দিন আগে পুনঃ দেশের বাড়ীতে গিয়াছিল। একা ঝুনাকে ফিরিতে দেখিয়া হিরণ্ময় সম্বন্ধে কত রকম যে সন্দেহ হইল তাহা আর লিখিলাম না।

ঝুনা আসিবার আধ-ঘণ্টা পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলিতে সক্ষম হইলাম না। তাহার বাড়ীর ও অন্যান্য লোকজনেরা তাহাকে বেড়াজাল দিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীর খবর শুনিবার জন্য আমি তেমন ব্যস্ত হই নাই। কারণ যত কিছু আসল কথা তাহা ঝুনা প্রথমেই আমাকে বলিবে।

অনেকক্ষণ পরে তার সঙ্গে কথোপকথন শুরু হইল। হিরণ্ময় আসিতে একটু দেরি হইতেছে। ক্রমে বর্ডারের অবস্থা খারাপের দিকে। কুমিরায় তাহাদিগকে নাকি কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির লোক খোঁজ করিয়াছে। তাই সে ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। ২/১ দিন পর ঝুনা কিছু আর্থিক সাহায্যও আমাকে করিল।

হিরণ্ময় (টুন্টু) আসিল না। আমি একা এতগুলি লোক নিয়া কোথায় যাইব এবং কি করিব তাহার চিন্তা জাগিতে লাগিল। যদি টুন্টু বাড়ী হইতে ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত তবে কিছু আর্থিক সাহায্য যোগাড় হইত।

আমি জানি, টুন্টু আসিয়া উক্ত যতীনবাবু ও চা-বেচুর নিকট আমার খোঁজ করিবে। তাহারাও সমদুঃখী কারণ আমি চলিয়া আসিব। ১৭/১৮ দিনে যে অকৃত্রিম মায়া তাহাদের কাছে পাইয়াছি তাহা লিখিবার মত ভাষা আমার নাই।

ছয়। আগরতলা ও ধর্ম্মনগর
৮ই মে হইতে ১০ই মে, ১৯৭১

৮ই মে/৭১ইং শনিবার সকালে ভাত খাইয়া মাথা ধুইবার পর হঠাৎ 'চল চল' শব্দ। কারণ সবাই চলিয়া যাইতেছে। আমি 'পরৈস্মপদী', সুতরাং কাজের লোক নহি। লরি দন্ডায়মান, মনু বাজারের দৃশ্যই আমাদের দৃশ্যকে দেখিতে লাগিল। জনপ্রতি ভাড়া ৫(পাঁচ) টাকা। দিলীপ ও ধনার ভার আমার উপর পড়িল। তাড়াতাড়ি যতীন বাবুর ৮ আট টাকা ও বেচুর ১.৮০ পয়সা দিয়া লরিতে উঠিলাম। দেশের লোক কান্নাকাঠি করিতেছে, কবে আর দেখা হয় না হয়। ছুটিলাম ঠাকুরের নাম নিয়া। সন্ধ্যার সাধারণ পুর্ব্বে আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। জায়গা নাই। কোন রকমে খোলা জায়গায় বসিয়া সারা রাত মশাকে নেমন্তন্ন খাওয়াইলাম। এদিকে জেঠী (প্রভা) মাখন বাবুর স্ত্রীর ডাইরিয়া শুরু হইল। তাহাকে Capsul খাওয়াইলাম। Homoeo Store থেকে ২/১ টা অতি প্রয়োজনীয় (নিজ ব্যবহার্য্য) ঔষধ খরিদ করিলাম। সকালে সাধারণ মুড়ি খাইয়া, গাড়ীর খোঁজে বাহির হইলাম, কারণ ধর্ম্মনগর যাইতে হইবে।

ধর্মনগরের গাড়ীতে চড়িলাম বেলা এগারটার দিকে। এটা ওটা, গুনাগুনি, নানা কাণ্ডকীর্ত্তণের পর একটা ট্রাক ছাড়িল। কি ভীষণ রাস্তা, কিছুক্ষণ পর পর মোড় ও উঠা নামা (১৮ মুড়া)। সেই রাস্তায় আর কোন দিন যাওয়া হইবে কিনা জানি না। ঘণ্টা খানেক চলার

পর যাত্রীদের বমি শুরু হইল। প্রথমে চৌধুরী বাড়ীর বড় বৌদি (বাবুলের মা) এবং তারপর ক্রমে অনেকেই বমি, পায়খানা করিতে শুরু করিল। নরককুন্ডই বটে! বমি ও পায়খানার উপরই চাপিয়া বসিয়া আছি এবং লেবু, লজেন্স ইত্যাদি বিলি করিতেছি। অবশ্য ভগবানের কৃপায় আমরা ২/৩ জন সে বিপাকে পরি নাই। কেহ বেহুঁসের মত হইল, মাঝে মাঝে জলের নিকট লরি দাঁড়ায়। জল খাওয়া ইত্যাদি চলে। লরি চালক (Driver) এর বাহবা আছে বটে।

সন্ধ্যা হইল। একটু বৃষ্টি আসিল। ঠান্ডা বাতাসে কাহিল হইলাম। উপায় নাই। হঠাৎ দুর্ঘটনা হইলে সবাই মরির। অতি কষ্টে অনেক জলের উপর দিয়া রাত আটটায় ধর্ম্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিলাম। টর্চ মারিয়া দেখিলাম, ছেলেরা জীবিত কি মৃত? দেখি সবাই জীবমৃত অবস্থায় আছেন।

চৌধুরী বাড়ীর সবাই প্লেটফরমের একদিকে গেল, আমরা অন্যদিকে আশ্রয় নিলাম। পুনঃ চিড়ামুড়ি চলিল। ষ্টেশনে ঘুরাঘুরি করিতেছি। সেই দিন রাত্রে গাড়ীতে উঠিতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতে শিলচরের গাড়ীতে উঠিয়া দুপুর দেড়টায় শিলচর আসিয়া পৌছিলাম।

সাত। শিলচর ও লামডিং

শিলচর পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই চৌধুরী বাড়ীর দাদা সুবোধ বাবুর ডাইরিয়া (Diarrhoea) শুরু হইল। প্লেটফরমে আবার দুই ভাগে জায়গা নিলাম। তখন আমার তাপসের জ্বর ও সর্দ্দি। পায়ে ফুলা, ধর্ম্মনগরের রাস্তার প্রতিফল। তাহার জন্য সাধারণ ঔষধ কিনিয়া আনার আগেই সুবোধদাকে ঝুনা, তার মা ও হীরেন্দ্রকে দিয়া শিলচর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম। পরে অন্য রিক্সায় আমিও গেলাম। স্নানের ও পানীয় জলের সুবিধা মন্দ নহে কিন্তু শিলচরে মাছির (Fly) উপদ্রব বেশী। তখন ছোট ছেলে আতসও অসুস্থ।

স্টেশনে মিলেটারিরা যেখানে টিকেট কাটে সেই টিকেট কাউন্টারের কাছেই আখেরা করিলাম। এ সময় হঠাৎ বাবু অরবিন্দু বিশ্বাস (কুমিরার হেরম্ব বিশ্বাসের ছোট ভাই) এর সাথে দেখা। তিনি আদর-যত্ন করিলেন এবং অনেক আলোচনার পর বলিলেন, লামডিং চলে যান।

অনেক লোক ও ভোলানটিয়ারগণ শিলচর কেম্পে ভর্তি হইবার জন্য বলিয়াছিল। কেন ঐ কেম্পে গেলাম না এবং তাহাতে যে কত বড় ক্ষতি হইল তাহা পরে লিখিব। দুইদিন পর সুবোধ দাদা ভাল হইলেন ও তাঁহারা সবাই শিলচর কেম্পে ভর্তি হইলেন। পরদিন সকালের মেইলে লামডিং রওনা হইলাম।

গাড়ীতে ভীড়, জামা পাকড় ও বিছানার অভাব, ছোট ছেলেদের বেঞ্চের নিচে মালের মত শোয়াইয়া রাখিলাম। অতি কষ্টে সন্ধ্যা ছয়টায় লামডিং আসিলাম। আবার প্লেটফরমে জায়গা নিলাম। চা-খাওয়া সারিয়া বাল্যবন্ধু ব্রজেন্দ্রের খোঁজ করিলাম। সেদিন দেখা হইল না। পরদিন সকালে বাসায় গিয়া দেখা হইল। বটু আসিয়া সবই দেখিল এবং মন্তব্য করিল, এত লোক সে তার বাসায় কিভাবে জায়গা দিবে? ব্রজেন্দ্রের কথায় মন পরিবর্তন হইল। এতগুলি লোক নিয়া কলিকাতার বাজারে আত্মীয়দের বাড়ীতেইবা কিভাবে উঠিব? ক্যাম্পে থাকাই শ্রেয় মনে করিলাম। হায়! যদি ক্যাম্পেই যদি থাকিব, তবে শিলচর বা মনুবাজার খারাপ কি ছিল? তখনও অবশ্য চন্দন নগরের বড় মাসীর নিকট হইতে কোন চিঠি পাই নাই।

লামডিং শহরে অস্থায়ী Camp আছে। ক্যাম্পের লঙ্গরখানায় খাওয়া চলিতে লাগিল।

বাহ্যিক সাহায্য ব্রজেন্দ্র যাহা করিয়াছে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু নিজের বল না থাকিলে Coramine injection এ কতক্ষণ রোগী রাখিতে পারে? ব্রজেন্দ্রর সাহায্যের মধ্যে শতরঞ্জী, কম্বল, মগ (জগ্), টিফিন বাটী, একটি ষ্টোভ, কয়েকটা খালি বোতল। হায়! কত বোতল লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। আজ একটি বোতলের দামও আমার হাতে নাই।

"তাপস" ১০৫

K. L. Chakraborty

একটু আগে এক যমুনা বৃষ্টি হইয়াছে, সাহিত্য বাসর ও সাজানো
মেঘাচ্ছন্ন, মধ্য রাত্রে ছেলে কে নিয়ে শ্মশানে যেতে হবে,
আমি সংযোগ হইতে না, ব্রাহ্মচন্দ্রের কোন হিং বর্ত্তমানে নাই,
শ্মশানের ও দরকার নাই, কারণ এক "সাইন বোর্ড" আছে সামনে
সারনাথী, ও পথিহারা "ঘুমাইয়া মরি", —

যাহা হোক, ছোটোর জন্য আমার নাই। সাত দিনের
গুটিনা চানিয়া নিয়াছে, লোক কম, কোন রকমে কেবল সামান্যের
দেশের "হিমাংশু শশি"কে সঙ্গে নিয়া মরণ বন্ধু, সাহিত্যবন্ধু
আমি নিজে এই সব চার জন চলিলাম, ভোর ৫টার সময়
আমি, সমাধিস্থল তার ছোট ভাই "আতসে" এবং "মিরু" সাথি
কাছেই। যাদের মাঁধবার জন্য এত সাত সমুদ্র পার হইলাম,
তাদের আর দেখাইর মাটিতে খুঁজিয়া পেলাম তখনই
চেহারা [illegible] গল্প মতে হইল: →

অফিসে (Relief transit) দৌড়াদৌড়ি করিয়া শুনিলাম, হোজাই কেম্প জায়গা ভাল ও সেখানে সুবিধা হইবে। লামডিং অফিস হইতে ক্রমিক নম্বর হিসাবে হোজাই কেম্পে পাঠায়। সেখানে সন্দ্বীপের একজন ছেলে সাহাবাবু (সাহা-দা) কাজ করে। লিষ্টে নাম উঠিল। ২০ (বিশে) মে দুপুরে রওনা হইব। এদিকে ছেলে দুইটার অসুখ। বড় ছেলে তাপস হাঁটিতে পারে না। ছোট ছেলের আমাশয়।

হীরেন্দ্র তার ছোট ভাই দীপক ও গীতাকে আগরতলায় তার দাদা (রথীন্দ্র) এর নিকট রাখিয়া আসিয়াছিল। ২/৩ দিন লামডিং থাকিয়া সে তাহার মামার বাসায় (গৌহাটি) যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হইল। নিজের ক্ষমতা যখন নাই, তাহাকে আটকাইয়া কি ফল হইবে? অন্তরে অন্তরে মরণযন্ত্রণা অনুভব করিলাম। কিছুই না বলিয়া মাথা নাড়িয়া ইশারা করিলামঃ 'যাও'।

সে অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল যে তাহাকে স্মরণ করা মাত্রই সে আসিয়া হাজির হইবে। রাত্রে সাড়ে আটটায় ট্রেন ছাড়িয়া দিল। তাপসকে কোলে নিয়া জানালার দিকে তার 'নুনু বদ্দার' যাওয়ার দৃশ্য দেখাইতেছি। সে শিশু, তার মনেও যে বিষাদের ছায়া নামিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ দুইজনেই এক প্রাণ ছিল।

আট। হোজাই
২০শে মে, ৭১ইং, বৃহস্পতিবার

লঙ্গরখানায় খাইয়া যাযাবরের মত জিনিসপত্র বাঁধিয়া লইলাম। পৌনে তিনটায় দুইটা বাস আসিল। কোন রকমে বাসে উঠিলাম। প্রায় (সন্ধ্যা) ৫ টায় বাস ছাড়িল। তখনও শিবুর (মাখন জেঠার ছেলে) জ্বর বেশি। যাহা হোক, সে কথা পরে হইবে। পুনঃ রাস্তার অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মনগরের রাস্তার কথা মনে হইল এবং হৃৎকম্প শুরু হইল। এক ঘন্টার মত পাহাড়ের রাস্তা শেষ হইয়া গাড়ি সমতলের রাস্তায় চলিল। রাত ৮টায় হোজাই কেম্পে'র সামনে বাস দাঁড়াইল। এক জায়গায় ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিতেছে, লোকজনের আনাগোনা আছে। ইতিপূর্বে প্রথম ২ বাস লোক আনিয়াছে। ১৮/২০ টি পরিবার।

দেখিলাম, মাত্র দুইটি ব্যারাক ঘর উঠিয়াছে। ৮×১১ হাত, পেছনে টিনের বেড়া, উপরে টিন, এবং খোলা ঘর। যে কোনটায় ঢুকি, আগেই জায়গা দখল হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন যে পরিবারগুলি আসিয়াছিল তাহারা পাকা ঘর অর্থাৎ হোস্টেল ও অফিস সংলগ্ন ভালো ঘরগুলি আগেই দখল করিয়া নিয়াছে।

কোন রকমে গড়মিলে মালপত্র ও নিজেরা সাধারণভাবে এক রাত্রির জন্য একটি ঘরে আশ্রয় নিলাম। Identification হইল ও অফিসার বলিলেন: নূতন ঘর তৈরি হইবে, ঘর দেওয়া যাইবে, আপাততঃ কোন প্রকারে থাকুন। কিভাবে যে সেই রাত কাটাইলাম তাহা ভগবান জানেন।

পরদিন বেলা তিনটার সময় ব্রজেন্দ্র দেখিতে আসিল। গল্প করিতেছি, এমন সময় কার্যকারকেরা হঠাৎ বাঁশের বেড়া দিয়া দিল। দেখি, আপনা আপনিই আমরা চারভাগে বিভক্ত হইলাম। কিরূপ তাহার বর্ণনা দিলাম:

১নং উত্তর দিকের কামরায় বাসন্তি (দিদি) সৃষ্টি ও পঞ্চু।
২নং মালের কামরায় আমার পরিবারসহ ছয়জন।

৩নং মাখন জেঠার পরিবারসহ চার জন।

৪নং দিলীপ, ধনা, অমিয়বাবু খোলা মাঠে।

সব মিলাইয়া মোট ১৭ (সতের) জন মেম্বার একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি। খাওয়া চলিতেছে লঙ্গর খানায়। দিবা কোন সময় ২/৩টায় এবং রাত্রি বারোটায়। থালাবাসন নাই। বাতি নাই। ঘরে ছোট ছেলেদের অসুখ। তাই এক সাথে সবার খাইতে যাওয়া সম্ভব হয় না। প্রথম ব্যাচে খাইতে না পারিলে পরে খাবারের অভাবও থাকে। কোনক্রমে ৩১/৫/৭১ইং পর্যন্ত কাটাইলাম। উক্ত তারিখে প্রথম রেশান পাইলাম।

এদিকে, এক রুমে তিন পরিবার করে থাকায় কান্নাকাটি ও ঝগড়া ইত্যাদি চলিতেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নূতন ঘর উঠিতেছে, কিন্তু খুঁটি পোতার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য লোকেরা সেই সব ঘর দখল করিতেছে। এইভাবে অনেক কষ্ট করিলাম। অফিসার এর কাছে আপত্তি করিয়া Accomodation এর সুব্যবস্থা হইল না বলিয়া মনে মনে নিজেকে ঘৃন্য বোধ করিলাম।

এইভাবে শেষে ২৬/৫/৭১ ইং S.D.C. (Subdeputy Collector R/R Hojai) সমীপে দরখাস্ত করিলাম: বাসস্থানের অভাবহেতু আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব। মনে হইল, দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া দিলেন, কিন্তু দরখাস্তের উপর কি যে তিনি লিখিলেন তাহা আমি ঠিক বুঝি নাই। এমন সময় হঠাৎ দেবদূতের মত এক হাজারী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি রুমে আটজন শরণার্থী ছিল। সেই আটজনকে অন্য রুমে ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের রুমে আমাদের সতের জনকে ঢুকাইয়া দিলেন। আমরা রুমে ঢুকিবার পর পরই ঝড়-তুফান শুরু হইল।

কোনও ক্রমে চলিতেছে। বেশির ভাগ লোককে বাহিরে খোলা জায়গায় থাকিতে হয়। কলিকাতা যাওয়ার Programme বাতিল হইল। ক্রমে আবহাওয়ার দরুণ ও সুচিকিৎসার অভাবে ছেলেদের অবস্থা চরমে উঠিতে লাগিল।

জুনের ১লা তারিখ ব্রজেন্দ্র (বটু) দেখা করিতে আসিল। জানাইল, হিরণ্ময় তাহাকে Telegraph (টেলিগ্রাফ) দিয়াছে, মাকে নিয়া লামডিং আসিতেছে। মন একটু আশ্বস্ত হইল। ব্রজেন্দ্র চলিয়া গেল। ৪/৬/৭১ইং হোজাই বাজারে শুনিলাম, লামডিং ব্রজেন্দ্রের বাসায় মা ও আরও ২/১ জন আসিয়াছে, মন টিকিল না। এগারটার (Dibrugarh mail) গাড়ীতে লামডিং গিয়া দেখিলাম, মা, হিরণ্ময়, ঝুনা (শিলচর) হইতে এবং আপেল রাণী (নমিতার মা) আসিয়াছে। কথাবার্তার পর হিরণ্ময় ও ঝুনা কেম্পে (হোজাই) আসিয়া আমাদের দেখিয়া গেল এবং রাত্রেই চলিয়া গেল।

কথা রহিল, সোমবার (৭/৬/৭১ইং) সকালে মা, হিরণ্ময় ও আপেল রাণী আসিবে।

নয়। শিবু

৬ই জুন, ৭১ইং রবিবার

সাধ করিয়া আমি নাম রাখিয়াছিলাম 'শিবু'। কেন রাখিয়াছিলাম তাহা আমিই জানি। অনেক বিপর্যয়ের পর দীর্ঘ দেড় বৎসর হইতে দুই বছর চিকিৎসার ফল শিবু। জেঠা মাখন বাবুর ছেলে। জন্মের ঠিক একমাস বিশদিন পরে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কোলে লইয়া মাখন জেঠা ও তার পরিবারের ভারতে আগমন। শিবুর জীবনের আজ শেষ দিন।

ছেলেকে আমার চিকিৎসাধীন রাখিবার মানসেই বন্ধু-বান্ধুব ত্যাগ করিয়া জেঠা আমার পাশ ধরিয়াছিল। কিন্তু যতই ঔষধ চলুক না কেন, পথ্যাপথ্য, অনিয়ম ইত্যাদি আর কত সহ্য হয়। ইতিমধ্যে ছোট দুধের শিশু কেম্পের মধ্যে মারা যাইতেছে। সুস্থ ও সবল ছেলের চেহারা বিবর্ণ ও ফ্যাকাসে হইতেছে। শিবু শুকাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে।

সেদিন রবিবার। কেম্পে আসা পর্যন্ত এক বাজার করিতে যাওয়া ছাড়া ঘরের বাহির হই নাই। সেদিন জেঠাসহ উত্তরদিকে রাস্তায় বেড়াইতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় প্রায় এক মাইলের মত গিয়া, রাস্তায় উপর একটি খাল ও খালের উপর একটি পুল দেখিতে পাইলাম। বৈকালিক ভ্রমণ শেষে কেম্পে ফেরৎ আসিলাম।

এখানকার হিসাবে অনেক চেষ্টা করিলাম। রাখা গেল না। রাত দেড়টায় শিবু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কেম্পের সংলগ্ন এক মাসীর চায়ের দোকান ছিল। মাসী International, অর্থাৎ সবার মাসী। মাসীর সাথে আমাদের সবার বড় ভাব ছিল। মাসীর কাছে গেলাম এবং শ্মশানের খবর লইয়া আসিলাম। সেদিন যেখানে বৈকালিক ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, জানিলাম, সেই স্থানটিই শ্মশান।

কেম্পে দিনে ঘর বাঁধার কাজ হয়, তাই বাঁশ ও কঞ্চির অভাব নাই [লাশ মাটি দেওয়ার সময় উপরে কিছু বাঁশ-কঞ্চি দিতে হয় যাতে শিয়ালে লাশ টেনে বের করতে না পারে।] দিলীপসহ দৌড়াদৌড়ি করিয়া একটা কোদালের (Spade) খবর পাইলাম। কোদালটি এক মেয়েছেলের এবং মেয়েছেলেটি ঢাকার। অনেক কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও 'কোদাল তার নয়' অজুহাতে সে কোদাল দিল না। শেষে কেম্পের এক অফিসার গিয়া কোদাল ও শাবল (খুন্তি) বাহির করিয়া দিলেন। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় শ্মশানে শিবুকে নিয়া ভোর পাঁচটায় গর্তের মধ্যে পুঁতিয়া কেম্পে ফিরিয়া আসিলাম।

দশ। পুনর্মিলন

সোমবার ৭/৬/৭১ইং সকালে আমার মা ও নমিতার মা (আপেলরাণী) আসিলেন। মা ও মেয়ের দেখা হইল। আমার মা'কে দেখিয়া আমার ছেলেমেয়েরা ও ভাগিনা-ভাগিনীরা উতলা হইয়া উঠিল। কারণ অনেক দিন পর তাহারা তাহাদের দিদিমা ও ঠাকুরমাকে পাইয়াছে।

হিরণ্ময় লামডিং বটুর বাসায় চলিয়া গেল। সে কেম্পে ভর্তি হইল না।

ইতিমধ্যে আপেল রাণী তাহার বোনের বাড়ীতে, গ্রামঃ বাসুগাঁও, থানাঃ কোঁকড়ঝার, জেলাঃ গোয়ালপাড়া, আসাম) তাহাদের পৌঁছসংবাদ দিলেন ও তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য চিঠিপত্র দিলেন। Camp Officer এর নিকট মেয়েকে সাথে লইয়া যাইবার জন্য দরখাস্তও করিলেন। অনেক প্রশ্নোত্তরের পর দরখাস্ত মঞ্জুর হইল এবং লামডিং ব্রজেন্দ্রের বাসায় তাহাদের মা ও মেয়েকে পাঠাইয়া দিলাম। ২/৩ দিন পর আপেল রাণীর বেহাই গনেশ সাহা গোয়ালপাড়া হইতে আমাদের কেম্পে আসিল। যথারীতি দিলীপকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে লামডিং পাঠাইয়া দিলাম। শুনিলাম, সেই রাত্রেই তিনি নিও বনগাঁই গাঁও (New Bangaigon) এর গাড়ীতে সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন।

ওঁ শান্তি। এতদিন পর একটা বিষবৎ বোঝা হইতে মুক্তি হইলাম। আমাদের মোট মেম্বার কমিয়া (১৭-২) ১৫ (পনের) হইল।

এগার। হোমিও সেবাসদন।

ডাঃ হিমাংশু চক্রবর্তী (এইচ.এম.বি.)

'বাহ্মনস্য ব্রাহ্মনায়াং জ্ঞাতি' বলে একটা কথা আছে। তিনি হোমিওপ্যাথ এবং আমারই মত তাঁহার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। ডাক্তার বাবুর চেহারা এবং ব্যবহার খুবই সুন্দর। কোন দিন পৌঁছ-পরিচয় নাই। অথচ কিভাবে আজ পর্যন্ত তাঁহার বুকে স্থান পাইয়াছি তাহা জানাইবার মত ভাষা আমার নাই। আমার চিঠিপত্র ডাক্তারবাবুর ঠিকানায় আসে। প্রতিদিন চিঠির লোভে গিয়া তাঁহার ডিসপেনসারিতে বসি।

শরণার্থীদের মধ্যে কত জন যে অস্থায়ী ছোটখাট ব্যবসা করিতেছে তাহার অন্ত নাই। আমরা দুই জন (মাখনবাবুসহ) চিন্তিত মনে বসিয়া থাকি, সংবাদপত্র দেখি ও ডাক্তার বাবুর সাথে অবসর

সময়ে রসিকতা করি। যাহা হোক, দিন যায়, কথা থাকে। তাঁহার সহকর্মী শ্রী মদন সিংহও আমাদের যথেষ্ট আদর-শ্রদ্ধা করেন। অথচ মুখের কথা ছাড়া আর কিই বা আমি দিতে পারি। যখন বসি, তখনই মাথার মধ্যে অনেক পুরানো গল্প, নিজের প্রতিষ্ঠান, তিন জন সহকর্মীর কথা ও হাজার হাজার জীর্ণ রোগীর ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কি করিব? দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় কি ?

ডাক্তার বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনেক রসিকতা করেন ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অবসর সময়ে আলোচনা করিয়া আমাদের মন উৎফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করেন। আন্তরিক সাহায্যও করেন। কিন্তু হায়! এইরূপ সাহায্যে কিভাবে মানুষ চলিতে পারে? কয়দিনই বা চলিবে, যাহা হউক, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার 'দান' মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি।

ইতিমধ্যে গৌহাটি হইতে হীরেন্দ্র (নুনুজেঠা) হোজাই কেম্পে আসিয়া আমাদের দেখিয়া গেল এবং কলিকাতা গেল। সেখানে সে যাদবপুরে মেঝ মামার সাথে দেখা করিল। আমরা মামা একটি ব্যাগসহ কতক ঔষধ আমাকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসার সুযোগ কেম্পে নাই। হীরেন্দ্র আবার তাহার মামার বাসায় গৌহাটি চলিয়া গেল।

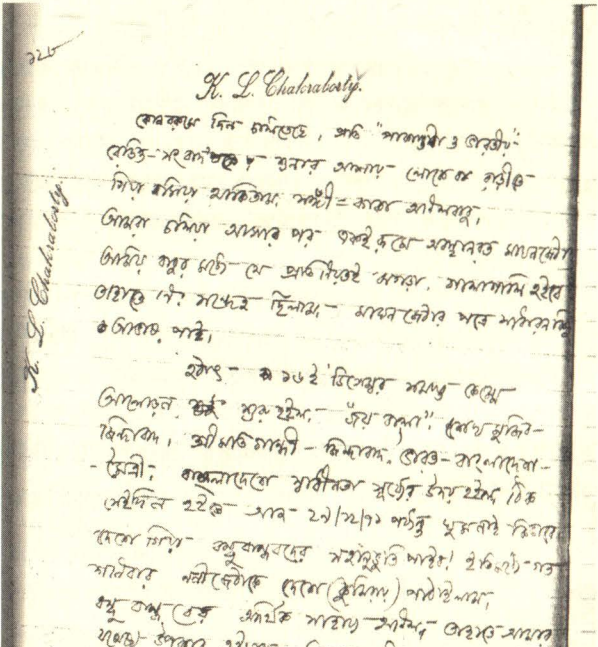

K. L. Chakraborty.

কোনরকমে দিন কাটিতেছে, অতি "সাবধানতা ও ভেরতীয়"
রেডিও-সংবাদ শুনার অপরাধে লোকের বড়ীতে
গিয়া ধরিয়া হাজিরা। সঙ্গী = কারা আটকবন্দী,
আমরা চলিয়া আসার পর পরই ক্রমে সমস্তরত সাধারণের
উপরি শুরু হইতে যে প্রতিবিধেই আসিয়া, সামলাইতে হইবে
তাহাতে ঐ সময়ের ছিলাম, — মাসন জেলের পরে সাবধানতা
ও আকাঙ্খা আছে।

ইতিঃ — ১৬ই ডিসেম্বর সমস্ত দেশে
আনন্দের শুরু হইল, — "জয় বাংলা", "বেথ মুজিব-
জিন্দাবাদ", "শ্রীমতি গান্ধী — জিন্দাবাদ, ভারত-বাংলাদেশ-
মৈত্রী"; বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হইল ঠিক
সেইদিন হইল — আর ২৭/১২/৭১ তারিখ মুক্তবাহিনী ক্যাম্পে
ফেরে গিয়া — বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতি পাইয়া। ইতিমধ্যে গত
শনিবার নদীয়া জেলার দেশে (কৃষ্ণনগর) পাঠাইলাম,
বন্ধু বান্ধবের আর্থিক সাহায্য সাহায্য — ভারত সরকার
যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, বিধান বড়ী — যাতায়াত করিয়া,

বার। আতস

১৮ ই জুন, শুক্রবার/৭১ইং

ছোট ছেলে আতস জন্ম (৯-২-৭১ইং) মঙ্গলবার বেলা পৌঁনে তিনটা। স্বাস্থ্য ভাল ছিল। কিন্তু শিলচর আসার পর আমাশয় এবং শেষে কাশি ও বমিভাব হইল। সর্বশেষে গুহ্য ও মুখে লাল ক্ষত দেখা গেল। অতি অল্প দিনেই স্বাস্থ্য শুকাইয়া গেল ও গলার স্বর বসিয়া গেল।

উক্ত ডাক্তার বাবুর নিকট চিকিৎসা করাইলাম। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। ১৮ই জুন, শুক্রবার ভোররাত্রি পৌনে চারটায় আতস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মৃত্যুর খবর যথারীতি অফিসে দিয়াছি।

এই বিষয়ে হীরেন্দ্রের নিকট চিঠি দিলাম। আসিতে পারিল না, জবাব দিল, যাহা হোক।

তের। তাপস

২৭শে জুন, রবিবার

মনুবাজার থাকাকালীন তাপসের সাধারণ জ্বর-সর্দ্দি ছিল। চলার পথে চিকিৎসার সুবিধা হইল না। শিলচর হাসপাতাল হইতেও ঔষধ নিয়াছিলাম। পরে লামডিং আসিয়া নিজেও ঔষধ দিলাম। হোজাই কেম্পে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নাই তখনও। ছেলেকে রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে সরকারী হাসপাতালে নিয়া গেলাম ২৫শে মে, ৭১ইং। ডা. সূত্রধর। সরকারী ডাক্তারখানার অবস্থা আমার অজ্ঞাত নহে, কারণ বিগত তের বৎসর যাবত ডাক্তার করিতেছি। ডাক্তারী শিখিতে না পারিলেও মানুষ চিনিতে শিখিয়াছিলাম। কেম্পের শরণার্থী হিসেবেই গেলাম। দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ১/৬/৭১ইং ডা. সূত্রধর বাবুর পয়সার লোভ ও গাফেলতি দেখিয়া এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ছেলেকে কোলে নিয়া হোজাই রেলওয়ে ষ্টেশনে দাড়াইয়া আছি। চোখের জল লজ্জায় আসে নাই।

হঠাৎ মনে হইল 'স্বধর্মে মরণং শ্রেয়'। আমি ছেলেকে হোমিও চিকিৎসাই করাইব। এতদিন সুচিকিৎসার অভাবে, আবহাওয়া ও সুপথ্যের অভাবে ছেলে একেবারে কাহিল হইয়া গিয়াছে। হাতে ও পায়ে ফুলা (শোথ), জ্বর, পায়খানা ইত্যাদি। কত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি আজ আমার ছেলের চিকিৎসা-বিভ্রাট।

হোমিও সেবাসদনে বসিয়া আছি। অল্পক্ষণ ডাক্তারবাবু তাপসকে নিরিক্ষণ-পরীক্ষণ করিলেন। ছেলে তাপসকে দিলীপের মারফৎ কেম্পে পাঠাইয়া দিলাম।

ডাক্তার বাবু আশীর্বাদ করিলেন। চিকিৎসা যথারীতি বিনা পয়সায় চলিতে লাগিল। জ্বর বন্ধ হইল, কিন্তু নিজের চা খরচ, ছেলের দুধ-মিশ্রি ইত্যাদি কিছুরই ব্যবস্থা করিতে পরিতেছি না। আমার দুই ছেলেকেই ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিয়াছেন।

১৮ই জুন শুক্রবার ছোট ছেলে মারা যাওয়ার পর আমার মা অধৈর্য্য হইয়া কেম্পের শরণার্থী ডাক্তার চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার (সরকার হাট) মির্জাপুর গ্রাম নিবাসী ডাঃ ফনী ভূষণ রায়কে (পুরান পদবী 'শীল') তাপসের চিকিৎসার ভার দিলেন। চিকিৎসা চলিতেছে। আমার শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বাবুকে সবকিছুই জানাইতেছি।

সেদিন ২৭শে জুন রবিবার। সারাদিন ছেলের অবস্থা একেবারে খারাপ ছিল না। পকেটে মাত্র তিনটি ভারতীয় নয়া পয়সাই সম্বল। পান-সুপারীর কিছু টাকা ও ডাক্তার বাবুর (ফনী বাবু) কিছু টাকা বাকী আছে, দিতে হইবে। সন্ধ্যা সাতটায় অনন্যোপায় হইয়া মায়ের নিকট হইতে ১৯১৮ইং সালের দুটা রূপার টাকা লইয়া বিক্রি করিবার জন্য হোজাই বাজারে গেলাম, কিন্তু রবিবার বলিয়া সেদিন দোকান বন্ধ ছিল। টাকা বিক্রি হইল না, অনেক বার ডাক্তার বাবুর নিকট পাঁচটি টাকা ধার চাহিব বলিয়া মনস্থ করিলাম। কিন্তু ঋষিবাক্য মনে উঠিল: 'বন্ধুর কাছে টাকা হাওলাত চাহিবার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা করিও, তোমার বন্ধুর দরকার বেশী, না টাকার? চাহিবামাত্রই পাইব, আশা আছে, কিন্তু লজ্জায় চাহিতে পরিলাম না। মনের দুঃখ মনেই রহিল। কিন্তু বাহ্যিক রস-কৌতুকও করিলাম।

এদিকে জেঠা মাখন বাবুর নিকট হইতে ২০ (বিশ) পয়সা হাওলাত নিয়াছিলাম পাওনাদার চুকাইবার জন্য। সেই বিশ পয়সা আমার হাতেই রহিল। চা-খাওয়াও গোল্লায় গেল। জেঠা বাসায় (কেম্পে) ফিরিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল। অবশেষে রাত নয়টায় উঠিলাম। পথে 'অজিত' নামে একটা চা-মিষ্টির দোকান, তার সামনে একটা টিউবওয়েল। জেঠা ও ভাইপোতে মিলিয়া ইচ্ছামত জল খাইলাম, পেট ভরিয়া গেল। জেঠাকে এই বলিয়া সান্তনা দিলাম, যদি বেশি ক্ষিধার সঞ্চার হয় তবে জল খাইও, ক্ষিধা নিবৃত্তি হইবে। কেম্পে ফিরিয়া আসিবার পথে আসাম-অয়েল এর নিকটে রিক্সা হইতে ভগ্নিপতি অমিয় বাবুর 'কানাই' ডাক শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না।

রিক্সা ওয়ালাকে হাতের বিশ পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি রুমে ঢুকিলাম। দেখি, ছেলের অবস্থা ভাল নয়, ডা. ফনী বাবু Coramine দিয়াছেন ও আশা ত্যাগ করিয়াছেন। ঘর লোকে লোকারণ্য। মেয়ে মিষ্টি ও ভাগিনা শিশির অর্ধভোজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের ব্যবস্থা আগে করিয়া মৃতপ্রায় শিশুর শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইলাম।

রাত এগারটায় চোখ খুলিল ও 'মা' বলিল। মনে শান্তি আসিল। বাঁচিবে না, তবে আজ রাত থাকিতে পারে। রাত ১১/১৫ মিনিটে পুনঃ খিচুনি শুরু হইল। এমতাবস্থায় কোথায় একটু মিছরির জল ও গরম দুধ দিব তা না, ছেলের মুখে টিউব ওয়েলের কাঁচা জল দিতে লাগিলাম। রাত বারোটায় ছেলে ফাঁকি দিল। তাহার মায়ের অবস্থা আর লিখিলাম না। দশদিন আগে ছোট ছেলে ও দশদিন পর বড় ছেলে ফাঁকি দিলে মায়ের অবস্থা অনুমেয়।

একটু আগে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ বাতাস আছে, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। মধ্য রাত্রে ছেলেকে নিয়ে শ্মশানে যাইতে হইবে। অগ্নিসংযোগ হইবে না, ব্রাহ্মণের কোন চিহ্ন বর্ত্তমানে নাই। শ্মশানেরও দরকার নাই। কারণ এক সাইনবোর্ড আছে, আমরা শরণার্থী। লক্ষ্মীছাড়া 'ইয়াহিয়া খান'!

যাহা হউক, চোখের জল আমার নাই। আজ দিলীপ ও ধনা তাহাদের বাবা-মায়ের নিকট চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং লোক কম। কোন রকমে কেম্পে আমাদের দেশের হিমাংশু শীলকে সঙ্গে লইয়া মাখন বাবু, অমিয় বাবু ও আমি নিজে সহ চার জন চলিলাম। ভোর চারটায় ফিরিয়া আসিলাম। সমাধি হল তার ছোট ভাই আতস এবং শিবুর অতি কাছেই। যাহাদের বাঁচাইবার জন্য এত সাত সমুদ্র পার হইলাম, তাহাদের আজ হোজাইর মাটিতে পুঁতিয়া দিয়া গেলাম। তখনই অনেক দিন আগে পড়া একটি কবিতার কথা মনে পড়িল:

'ডেকে দাও, ডেকে দাও, দাদারে আমার,
একা আমি পারি না খেলিতে,
আইল নিদাঘ লয়ে ফল ফুল ভার,
দাদা মোর গেল কোন পথে?
দু'ভায়ে রূপেছি তরু, যতন করিয়ে
জল বিনা তারা শুকাইল,
লতাগুলি পড়ে রইল, মাটিতে লুটায়ে
তবু মোর দাদা নাহি এল'।

পরদিন সংবাদে জানিলাম, হিরণ্ময় ও ব্রজেন্দ্র গৌহাটিতে আছে। সুতরাং তাহাদের চিঠি দেওয়া বৃথা। তাই শিলচরে ঝুনার কাছে ও গৌহাটিতে হীরেন্দ্রের নিকট চিঠি দিলাম। মাথা অস্থির। বোধ হয় এইভাবে লিখিয়াছি।

Express Letter

১নং

হীরেন্দ্র (নুনু জেঠা)

Hojai, 28/6/71
Jetha,
'Tapash' expired last night (at 12), inform Brajendra & Tuntu at Gauhati. Come immediately any how.
Kanai

২নং
ঝুনা (শিলচর)

Jhuna,
Tapash expired last night (at 12). Come immediately (if possible).
Kanai

যথারীতি তিন দিন অশৌচ শেষ করিলাম। চতুর্থ দিবসে তাপসের উদ্দেশ্যে ভাত দিব। সে জীবিত থাকাকালীন যাহা যাহা পছন্দ করিত, তাহাই একটু একটু আনিলাম ও ভাত দিলাম। মনে হইল, আমি কত বড় দুর্ভাগা। লোকে নিজের মা ও বাবার উদ্দেশ্যে ভাত দেয়, আর আমি ছেলের উদ্দেশ্যে ভাত দিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালে খুবই ভোরে পুনঃ দেখিতে গিয়াছি, ছেলে ভাত খাইল, নাকি শেষ বারের মত মা-বাবার উপর অভিমান করিল? না, অভিমান করে নাই, খাইয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া সকাল ছয়টার পুনঃ তন্দ্রাভিভূত হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরে শুনি কান্নার রোল। চোখ খুলিয়া দেখি, হীরেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র (বটু) ও টুন্টু আসিয়াছে।

ইতিপূর্বে অনেক স্বপ্নই দেখিয়াছি। আতস মারা যাওয়ার ৩/৪ পর একদিন স্বপ্নে দেখি, দেশের বাড়ীতে কোঠার উত্তর দিকের কামরা হইতে বড় ছেলে তাপসকে টানিয়া লইয়া গিয়া বাড়ীসংলগ্ন দেওয়ানজী বাড়ীতে শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ চিৎকার শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল।

সংখ্যায়, যোগ-বিয়োগের প্রশ্ন আসিল।

শিবু, তাপস, আতস মৃত।

নমিতা, দিলীপ, ধনা ও জেঠার শাশুড়ী কেম্প হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

শেষে মাকে ভর্তি করা হইল।

তখন আমার কার্ডে (Identify Card) মোট নয়জন ও মাখন জেঠার কার্ডে মোট দুইজন হইল।

চৌদ্দঃ প্রত্যাবর্তন

পরদিন কেম্প-অফিস হইতে ডাক আসিল। S.D.D. স্বয়ং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে Identify Card হইতে ছেলেদের নাম কাটিয়া দিলেন। এই কেম্পে প্রথম রেকর্ড ভঙ্গ করিলাম। অবশ্য বর্তমানে আমার মত দুর্ভাগা আরও অনেক আছে।

পর দিন Camp Gi Medical Officer Statement এর জন্য ডাকিলেন ও মৃত ছেলেদের চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। উত্তর দিলামঃ 'আমার ছেলের রোগের প্রাথমিক ও মাঝামাঝি সময়ে কেম্পে চিকিৎসার কেন্দ্র খোলা হয় নাই।' শেষ প্রশ্ন আসিলঃ 'আপনার ছেলেদ্বয় মারা যাওয়াতে আপনার কোন অভিযোগ আছে? এক মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া জবাব দিলামঃ 'না। অভিযোগ কিসের? আমি নিজে মরিয়া গেলেও কোন অভিযোগ নাই।'

এই পর্যায়ে কয়েকদিন পর মনে করিলাম, কলিকাতা একটু ঘুরিয়া আসি। গত ৯/৭/৭১ তাং শুক্রবার রওনা হইয়াছিলাম। কলিকাতায় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সঙ্গে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও অভিভাবক নরেশ বাবুর সঙ্গে এবং বিশিষ্ট ভাগিনা অরবিন্দ চৌধুরীর (বাবুল) সংগে দেখা হইল। কিছু ভিক্ষাও জুটিল। ১৯/৭/৭১ইং কলিকাতার গাড়ীতে উঠিয়া ২১/৭/৭১ইং হোজাইতে ফিরিলাম।

ইহার কিছু দিন পরেই কেম্পে গৃহবিবাদ শুরু হইল এবং ইহাতে আমার মন ভারাক্রান্ত হইল। মনে করিলাম, এই কেম্প হইতে নিজ স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভাগিনা শিশিরকে নিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইব। দরখাস্ত করিলাম ২৪/৭/৭১ইং। আমাদের অফিসার SDC আমার দরখাস্ত D.C. (R.R. DEPT) Nowgong এর কাছে Forward করিলেন। আজ ১৫ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কি হয় জানি না। রেশান পাওয়া সত্ত্বেও চা পান বন্ধ করিয়াছি। কেম্প ছাড়িয়া দিলে, রেশানও পাইব না। তখন কি অবস্থা হইবে? কিন্তু এখানে আর থাকিব না, এই দৃঢ় পণ। এদিকে খবর আসিতেছে, দেশের অবস্থা

ভাল। কিন্তু ভারত-মাতা কোল হইতে নামাইয়া দিলেই যাইব, নয়ত নয়।

বর্তমানে চলিতেছে কিভাবে তাহা জানি না। যে ভিক্ষাবৃত্তিকে একদিন মনে প্রাণে ঘৃণা করিতাম, তাহাই আজ আমার পেশা হইয়াছে। অবশ্য 'শিক্ষিত ভিক্ষুক' আমরা, আমাদের কায়দা কানুন আলাদা! বাকী আর কতদুর নীচে নামিতে হয় তাহা ভগবান জানেন।

এখানে মন টিকিতেছে না, অন্য কোথাও যে ভাল লাগিবে তাহাও নহে, কারণ কর্মহীন অবস্থায় আমার কী ভীষণ খারাপ লাগিতেছে তাহা বলার অযোগ্য। ভাগিনা শিশিরেরও লেখাপড়া বন্ধ। বাড়ীতে থাকাকালীন খাতা ও কলমের অভাব ছিল না। সময়ের অভাবে তাহাকে পড়াইতে পারি নাই। আজ সে খাতা-কলমের অভাব ভোগ করিতেছে। যাই হোক, 'জয় বাংলা' হইলেই বাড়ীতে ফিরিব। ইতিমধ্যে প্রত্যহই বাড়ী যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্ন সফল হইবে কিনা পরম করুণাময় জানেন।

২৮/১২/৭১; সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট। মঙ্গলবার।

পাঠকবর্গের নিশ্চয় মনে আছে গত ২৪/৭/৭১ইং শনিবার আমার নিজের পরিবার নিয়া (অর্থাৎ বোনের পরিবার ও মাখন জেঠার পরিবার উক্ত হোজাই শিবিরে রাখিয়া) অন্য যে কোন কেম্পে চলিয়া গিয়া পারিবারিক অশান্তির সমাপ্তি দিবার মানসে Camp Office এর Trough w`qv D.C R. Dept. Nowgong, Assam এর কাছে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলাম। এছাড়া আমি ইতিপূর্বে এই কেম্প অফিসে একটি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। ২৪/৭/৭১ইং শনিবার তারিখেই আমার দরখাস্তের উত্তরে হোজাই শরণার্থী শিবির অফিসে সাধারণ লিখাপড়ার কাজে ডাক পড়িয়াছিল। অফিসে গিয়া 'না' করিয়াছিলাম, কারণ আমি এই কেম্প হইতে Release এর দরখাস্ত করিয়াছি। এক সপ্তাহ পর পর খবরাখবর নিতেছি, কবে আমাকে রিলিজ দিবে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু ঘটনার কথা বলি। হোজাই শরণার্থী শিবিরে রেশানপত্র নিয়মিত চলিতেছে, কিন্তু তখনও সরকার নগদ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নাই। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে পুরানো অফিসার, বাবু সুশীল দাশ (অহমিয়া) S.D.C, জ.জ Hojai আমাদের শিবিরের কার্য্যভার হইতে অবসর নিয়া কাছাকাছি নীলবাগানে নূতন একটি শরণার্থী-শিবির নির্মাণের ভার হাতে নিয়াছেন। হোজাই শরণার্থী-শিবিরে নূতন অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন বাবু নির্মল চৌধুরী। বিশ্বস্ত সুত্রে জানিতে পারিলাম কোন এক কালে উনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন এবং বেশ কয়েক বৎসর ধরে তিনি Refugee Camp এ A.R.O. হিসাবে কাজ করিতেছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহার চাকুরী-জীবনে মাত্র চারবার তিনি Suspend হইয়াছেন! তার কার্যকলাপের আরও বিশেষত্ব এই যে, হোজাই শরণার্থী শিবির তৈয়ার হইবার অল্প আগে তিনি লামডিং শহরে অস্থায়ী এক শরণার্থী শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন এবং সে সময়ে সেই অস্থায়ী শিবিরে দারুণভাবে বিপর্যস্ত ও হৃদয়ভাঙ্গা শরণার্থীদের তিনি দুই বেলা উপবাসী রাখিয়াছিলেন। হোজাই শিবিরের ২৫০০ শরণার্থী নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলিতে দ্বিধা করিত। অথচ পুরানো অফিসার সুশীলবাবুর আদর ও শাসনে শরণার্থীগণ ভালোই ছিলেন। নূতন অফিসারের আমলে অফিসের কার্য্যক্রম ও রেশনের ব্যাপারে কিছুটা রদবদল হইল যার প্রায় সবই শরণার্থীদের অশান্তির পরিপূরক হইল।

ইতিমধ্যে গৌহাটিতে নানা বিশৃঙ্খলা [জাতিগত দাঙ্গা] দেখা দেওয়ায় হীরেন্দ্র ও তার ভাই দীপু যে কোন শরণার্থী শিবিরে ভর্তি হওয়ার মানসে হোজাই আসিয়া দেখা করিল। আমিও মনে মনে তাহাদের সঙ্গী হইতে মনস্থ করিলাম।

ইতিমধ্যে আমার মায়ের সাধ হইল, এত দুরে আসিয়া এবং রেলভাড়া ছাড়া যাদবপুর [কলিকাতা] গিয়া ভাইদের সঙ্গে দেখা না করিলে আর এই সুবর্ণ সুযোগ মিলিবে না। মনে করিলাম, আমাকে নিজের পরিবার লইয়া সহজ পথে বা বক্র পথে অন্য যে কোন

শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হইবে। এমতাস্থায় মা এবং শিশিরকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিতে পারিলে ঝামেলামুক্ত হইব।

সেদিন মঙ্গলবার, ৭.৯.৭১ ইং বটুর সঙ্গে দেখা করিতে লামডিং গেলাম। সঙ্গে মাখন জেঠাও আছে। অল্পক্ষণ কথোকথনের পর হঠাৎ বিশিষ্ট বন্ধু মাষ্টার সন্তোষবাবু আসিয়া উপস্থিত। যে সন্তোষ বাবুকে মিরেশ্বরাই বাজারে পাঞ্জাবীর কবলে পতিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম দীর্ঘ পাঁচ মাস পর সেই বিশিষ্ট বন্ধুকে হঠাৎ দেখিয়া মনের অবস্থা তড়িৎগতিতে তোলপাড় হইয়া গেল। কথোপকথনে জানিতে পারিলাম, ত্রিপুরার হরিণা শরণার্থী শিবিরে প্রতিবেশী টুকু চৌধুরী, অনিল বাবুদের নিকট আমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা যাওয়ার পথে হোজাই পৌছিবার আগেই সৌভাগ্যক্রমে লামডিং শহরে আমার সহিত তাহার দেখা হইল।

যথারীতি সন্তোষ বাবুসহ সন্ধ্যায় হোজাই ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি নয়টায় ননী ও দীপকও আসিয়া পড়িল। তখন মায়ের কলিকাতা যাওয়ার বায়না প্রবল হইতে প্রবলতার উঠিল। শিশিরবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহে। যদি তার দিদিমা সঙ্গে না থাকিত তার মা ও বাবার সঙ্গ ছাড়িয়া সে আমার সঙ্গেই থাকিত। শেষ পর্যন্ত দিদি ও নাতিকে উক্ত সন্তোষবাবুর সঙ্গে দুই একদিনের মধ্যেই কলিকাতা পাঠাইয়া দিব স্থির করিলাম। কিন্তু সমস্যা হইল, তখনও কেম্প হইতে রিলিজ হইতে পারি নাই। আমি রিলিজ না নিয়া গেলে ভগ্নীপতি অমিয়বাবু রেশান তুলিতে পারিবেন না।

পুরানো অফিসার সুশীল বাবুর বাসায় গিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারিক অশান্তির কথা ভালভাবে বুঝাইয়া উক্ত কেম্প থেকে পলায়ন এবং অন্য কেম্পে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার বুদ্ধিই গ্রহণ করিলাম। তাঁহার উপদেশ অনুসারে গত ১০.৯.৭১ ইং শুক্রবার নূতন অফিসার নির্মলবাবুর সমীপে এক দরখাস্ত পেশ করিলাম। দরখাস্তের সারমর্ম এই: 'আগরতলায় আমার ছোট ভাই হিরণ্ময় (টুন্টু) খুব বেশী অসুস্থ। তাহার শুশ্রূষার জন্য উক্ত সন্তোষ বাবু ও আমার পরিবারকে নিয়া মা ও শিশিরবাবুসহ আগরতলা যাইব।'

পনের দিনের ছুটি চাহিলাম। দরখাস্তে দুই একজন সুপারিশদারের স্বাক্ষরেরও দরকার হইয়াছিল।

কোন রকমে দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর হইল। চৌধুরী বাবুকে বড় রকমের একটা নমস্কার করিয়া অফিসকক্ষ ত্যাগ করিলাম। পরদিন দুপুরে ডিব্রুগড় মেইলে সন্তোষবাবুর সঙ্গে মা ও শিশিরবাবুকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম। ১২/৯/৭১ ইং সকাল দশটায় আমরা উক্ত ক্যাম্প হইতে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। ইতিপূর্বে সন্তোষবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, ত্রিপুরার অনেক শরণার্থী শিবিরে আমাদের গ্রামের অনেক পরিবারই শরণার্থী হিসাবে আছেন। তাহাদের কাছাকাছি আশ্রয় লইলে মনে কিছুটা শান্তি হইবে।

শরণার্থীদের রেলভাড়া ফ্রি, কিন্তু ৩/৪ দিনের পথ। পথের খরচ ও এদিকে বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া ইত্যাদি খরচ পোষণের জন্য হোমিও সেবাসদনের ডাক্তারবাবুর নিকট একটা স্বর্ণের হার বিক্রয় করিয়া কোন রকমে ৩০০ (তিন শত) টাকার মত নিয়াছিলাম। হোজাই শরণার্থী শিবির ত্যাগ করিবার সময় উক্ত শিবিরের অনেক মেয়ে ও পুরুষ আমার জন্য কান্নাকাটি করিতেছে, কারণ শিবিরে সকলের আদরণীয় ছিলাম। ভগ্নীপতি অমিয় বাবুও কান্নাকাটি করিলেন। বিশেষতঃ বাঁশিদির (আমার দিদির) কান্নাকাটিতে একেবারে মনে আঘাত আসিল। কারণ, এই ভাবে দূর দেশে অসহায় অবস্থায় এক সাথে মা ও ভাই ছাড়িয়া গেলে কষ্ট হইবারই কথা।

আসিবার সময় অমিয়বাবুর হাতে ১৫ (পনের) টাকা দিয়া আসিলাম। ডাক্তার হিমাংশু চক্রবর্তী আসিবার সময় আমার মেয়ে মিষ্টিকে জামা কিনিয়া দিলেন এবং আমাকে ডাক্তারী করিবার জন্য কিছু ঔষধপত্র, থার্মোমিটার ইত্যাদি সাহায্য করিলেন। হোজাই রেলওয়ে স্টেশনে অমিয়বাবু ও মাখনবাবু আগাইয়া দিতে আসিলেন। যথারীতি সকাল এগারটায় ট্রেন ছাড়িয়া দিল ও বিকাল তিনটায় লামডিং বটুর বাসায় এক রাত্র থাকিয়া পরদিন সকালের ট্রেনে উঠিয়া রাত্রে তিনটায় ধর্ম্মনগর ষ্টেশন আসিয়া পৌঁছিলাম। পরদিন প্রাতে বাসে উঠিলাম ও পাহাড়ের কঠিন রাস্তা পার হইয়া

রাত ৮ টায় আগরতলা পৌঁছিলাম। ভাতের হোটেলে কোন রকমে রাত্রিভোজন সারিয়া আপাততঃ আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে এক খোলা বারান্দায় প্রবাস কাটাইলাম। মশার নিমন্ত্রণ চলিল বটে।

পনেরঃ হরিণা

পরদিন সকালে টুন্টুর সঙ্গে দেখা করিয়া জীপে চড়িলাম ও উদয়পুর আসিয়া পালাটানা কেম্পে আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় গেলাম। দীপু ও ননী সঙ্গে আছে।

পরদিন বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় মনুবাজার আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন আমাদের প্রতিবেশী দাদা মনোরঞ্জন চৌধুরী (দিলীপ ও ধনার বাবা) মনুবাজারে ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন। কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাসায় এক রাত্রি যাপন করিলাম। কিন্তু শুনিলাম, তিন মাইল দূরে হরিণা কেম্পে তাঁহারা ঘর পাইয়াছেন এবং পরদিনই ওনারা সেই ভাড়াটে বাসা ত্যাগ করিয়া সেইখানে চলিয়া যাইবেন। হায়রে দুভার্গ্য! এত কষ্ট করিয়া আসিয়াও বোধহয় শেষ ফল হইল না।

সন্ধ্যায় হীরেন্দ্রসহ হরিণা পরিদর্শনে বাহির হইলাম এবং তাহার বন্ধু-বান্ধুবের সাহায্যে বর্তমানে ভাড়া বাসাটি ঠিক করা হইল। ভাড়া প্রতি মাসে বার টাকা। পরবর্ত্তী ২/১ দিনের মধ্যেই (কার্ড) Identify Card হইল। রেশান ও নগদ টাকা (আর্থিক সরকারী সাহায্য) পাইতেছি।

শুধু হরিনায় নহে, প্রায় সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ভাংতি পযসার অভাবে বাজার খরচ করা খুবই কষ্ঠ। প্রথম প্রথম বিরক্ত হইতাম, বর্তমানে অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

হোজাই থাকাকালীন স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা, সংবাদপত্র পড়া, রেডিও শোনা ইত্যাদির কোন সুযোগ পাই নাই, কারণ অধিকাংশ শরণার্থীই চাষাভুষা ও খেটে খাওয়া লোক ছিল। হরিণায় কোন রকমে ২/৪ দিন চলার পর বয়োবৃদ্ধদের

অনুরোধে (অনিল বাবু, সুনীল বাবু, মামা সুমন্ত প্রভৃতি) দীর্ঘ ৫/৬ মাস পর পুনঃ তাসখেলা হাতে নিলাম। এখানেও অবশ্য লেখাপড়ার কোন সুবিধা নাই, কাগজপত্র, কালি-কলম ইত্যাদি সব কিছুই অগ্নিমূল্য। কোন রকমে দিন চলিতেছে। পাকীস্তানী ও ভারতীয় রেডিওর সংবাদ শুনার আশায় প্রতিদিন লোকের বাড়ীতে গিয়া বাসিয়া থাকিতাম। সঙ্গী কাকা অনিল দাশ।

ষোলঃ জয় বাংলা

হঠাৎ ১৬ই ডিসেম্বর, সমস্ত কেম্পে আলোড়ন শুরু হইল। 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ', 'শ্রীমতি গান্ধী জিন্দাবাদ', 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ'। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সুর্য্যের উদয় হইল। ঠিক সেইদিন হইতে আজ ২৯/১২/৭১ পর্যন্ত ঘুম নাই। শুধু চিন্তা, কিভাবে দেশে গিয়া বন্ধুবান্ধুবদের সহানুভুতি পাইব। ইতিমধ্যে গত শনিবার হীরেন্দ্রকে দেশে (কুমিরা) পাঠাইলাম।

কুমিরার বন্ধু-বান্ধবেরা আর্থিক সাহায্য পাঠাইলেন। তাহাতে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এখন বাড়ী যাওয়ার তাগিদ। ইতিমধ্যে অনেক শরণার্থী নিজের খরচেই দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। বোধ হয় আগামী ২রা জানুয়ারী রবিবার আমাদেরও কেম্প হইতে Release করা হইবে। হীরেন্দ্রের মুখে শুনিলাম, প্রাণের জেঠা মনোরঞ্জন বাবু, কাকা শুধাংশু ঘোষ দেশে জীবিত আছেন। কম্পাউন্ডার খোকন আমার অবর্তমানে রোগীপত্র দেখিতেছে। কখন তাহাদের সহিত দেখা হইবে এখন তাহাই শুধু ভাবনা

পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা, যেন অতি সহসা দেশে ফিরিয়া গিয়া নবজীবনে, নূতন সুরে পুনঃ মুকলিত হইতে পারি।

এতদিনে বুঝি ভারতমাতা তাঁহার কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। ইতি ১৯/১২/৭১, বুধবার।

শ্রী কানাই লাল চক্রবর্তী

সারণি

অনিল দাশ ২৩, ৭৯, ৮২
অমিয় ভট্টাচার্য্য ১৯, ৩২, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৬, ৫০, ৬৫, ৭৩, ৭৯, ৮০
অমল চৌধুরী ৫৩
অমৃত চক্রবর্ত্তী ৫৪, ৬৯
অরবিন্দ বিশ্বাস ৬১
অরবিন্দ চৌধুরী (বাবুল) ৭৬
আওয়ামী লীগ ২৭, ৩১
আবুল কালাম ১৮
আকিলপুর ২১
আগরতলা ৫১, ৫৯, ৭৯-৮০
আগরতলা দূর্গাবাড়ী ৫৯, ৮১
আজমল হোসেন খান ২১
আতস ৩৭, ৩৮, ৫৮, ৭১, ৭৪
আনোয়ারা জুট মিল ৪২
আপেল রাণী ৬৬, ৬৭, ৬৮
আবদুল রহিম ২৪
আবুল কাসেম লেদু ২৪, ২৯, ৩২
আমিনুর রহমান ২৪
আলেকদিয়া ১৮
ইউনুছ ২৪, ২৮
ইন্দিরা গান্ধী ৮২
ইয়াহিয়া খান ১৭, ৭৩
এম. এ. জামান ২১
উদয়পুর ৫৩, ৮০
কর্নেল হাট ২৭
কলাছড়া ৫৮
কলিকাতা ৬৫, ৭৯
কামাল কাদের ১৮

কাজীপাড়া ৩৫
কাঠগড় ৪০
কাট্টলি ২৮
কালাবুড়ি ৫৪
কুমিরা ১৩-৩৩, ৪২, ৫৮, ৬১, ৮২
কুমিরা উচ্চ বিদ্যালয় ২৮
কুমিরা যক্ষ্মা হাসপাতাল ১৮, ২৪, ৩৯
কুমিল্লা ১৭
খায়ের হোসেন ৩২
খোকন চন্দ্র ধর ২৯, ৮২
গণেশ সাহা ৬৮
গীতা দে ৫৮, ৬৩
গুরুপদ চক্রবর্ত্তী ২৮
গৌহাটি ৬৩, ৬৮, ৭৮
ঘোড়ামারা ১৮, ৩২
চট্টগ্রাম শহর ১৭, ২৫
চন্দন নগর ৫৭
চড়কপূজা ৩১
চারুবালা চক্রবর্ত্তী ২১, ৩২, ৩৮, ৬৬-৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৮, ৭৯
চাঁন মিয়া ২৪, ৩৯
চৈত্রসংক্রান্তি ৩১
চৌধুরী বাড়ী ২১-২৩, ২৫, ৫১, ৬০
ছোট কুমিরা ৩৯, ৫৩
জগদ্ধাত্রী ২২, ৩২
জমাদারপাড়া ২১
জয়বাংলা ৭৭, ৮২
জাফর নগর ৪১, ৪৫, ৫৩
টিক্কা খান ১৭, ২২
ডিব্রুগড় মেইল ৬৬, ৮০
ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড ১৭, ২৪

তাপস ৩৫, ৪৫, ৫৮, ৬৩, ৭১-৭২, ৭৪
তেজেন্দ্র চৌধুরী ৪১-৪৩
ত্রিপুরা ৫৭, ৭৮, ৮০
দিলীপ চৌধুরী ৪১, ৫৪, ৬৫, ৬৮, ৭৪, ৭৫
দিলীপ দে ৩৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৮-১৯
দীপক দাশ (ননাই) ৫৩
দীপক দে ৫৮, ৬৩, ৭৯
দীপ্তি চক্রবর্ত্তী ৩৭-৩৮, ৭৩
দুলাল চৌধুরী ১৯, ২৩, ২৬, ৩২, ৪০-৪১
দুলাল শীল ৫৪
দৈববাণী ৩২
দারোগা হাট ৪১
দোলপূজা ৩১
দেবেন্দ্র (ধীরেন্দ্র) দত্ত ৫১-৫২
ধর্মনগর ৫৫, ৫৯, ৬৪, ৬৬, ৮০
ধীরেন্দ্র দে ৫৪
ধুম-বাস ৪১
নজরুল ইসলাম মন্টু ৩৫
নমিতা সাহা ২৮, ৩৫, ৩৭, ৫৮, ৬৮, ৭৫
নাজিরহাট ২৭
নরসিংগড় ৫১
নরেন্দ্র দাশ ২৩, ২৬, ৩২, ৩৪
নরেশ চৌধুরী ৭৬
নিউ বনগাঁইগাঁও ৬৮
নিজামপুরী (মৌঃ ফোরক) ২৪
নিরঞ্জন চৌধুরী ২৩
নির্মল চৌধুরী ৭৮-৭৯
নেপাল বিশ্বাস ৪৯
নেপাল মিস্ত্রী (দে) ৫০

নূরল আলম ৩৯
পঞ্চু ৩৭-৩৯, ৬৫
প্রভা দে ৩৮, ৫৯
পরেশনাথ দে ৫৪
পাঞ্জাবী/পাকসৈন্য ১৭-১৮, ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ৩১, ৪০, ৪৪, ৪৬-৪৭
পারুলবালা দেবী ৫৭
প্রণব চৌধুরী (ধনা) ৫৩-৫৪, ৬৫, ৭৪-৭৫
প্রবোধ চৌধুরী ৫৫
প্রিয়রঞ্জন ৩২
ফকিরবাড়ীর মসজিদ ২৩
ফরিদ আহমেদ ৩৫
ফণীভূষণ রায় ৭২
ফৌজদারহাট কেডেট কলেজ ২৫, ২৭
বঙ্গোপসাগর ২৫-২৬, ৪০
বার আওলিয়া ২৫
বাঙালী সৈন্য (ই.পি.আর.) ১৮, ২৯, ৩২, ৪০, ৪৩
বাবুলের (অরবিন্দ চৌধুরীর) মা ৬০
বারৈয়ার হাট ৪৬
বাসন্তী ভট্টাচার্য্য (বাঁশিদি) ৩৫, ৩৮-৪০, ৪৬, ৫০, ৬৪, ৮০
বাঁশবাড়িয়া ৪০
বাড়বকুণ্ড ৪০,৪২
বিদ্যাবালা দে ৩৮, ৫১, ৭৫
বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী ৫৩, ৮১
বিনোদ শুক্লদাশ ৩২-৩৩, ৩৮, ৪০
বিমল চৌধুরী (টুকু চৌধুরী) ২১, ৩৯, ৫৩, ৭৯
বিমল দে (বেঙ) ৫৩
বেচু ৫৪, ৫৯
বৈরাগী পুকুর ৩৫
ব্রজেন্দ্র সাহা (বটু) ৫৫, ৬১, ৬৪,৬৬,৭৪, ৮০
ব্রাহ্মণ ৪২, ৪৯, ৬৮, ৭৩

ভাটিয়ারী ২৮
মছজিদ্যা ২২, ৩৯
মছজিদ্যা উচ্চ বিদ্যালয় ৩৯
মদন সিংহ ৬৯
মমতাজুল করিম ২১
মনু বাজার ৫০, ৫১, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৮০
মনুবাজার উচ্চ বিদ্যালয় ৫১, ৫৩
মনোরঞ্জন চৌধুরী ৩৮, ৮০
মনোরঞ্জন দে ১৯, ২২, ২৯, ৮২
মনিরউল্লাহ (বি.এস.সি.) ৩২
মাখন লাল দে ২৪, ৩১-৩২, ৩৪, ৩৮, ৪৫, ৪৯, ৫১, ৬৫-৬৮, ৭২, ৭৭, ৭৯-৮০
মানোয়ার ২৬
মাসী ৬৭
মাস্তান নগর ৪৬
মিরেশ্বরাই ৩১, ৩৩, ৪১, ৪৩, ৪৫-৪৬, ৭৯
মিষ্টি ২১, ৩৫, ৩৭, ৪৫, ৭৩
মুকুল বিকাশ চৌধুরী (ঝুনা) ২৩, ২৬, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৫২, ৫৫, ৫৮, ৬০, ৬৬, ৭৪
মেশিনগান ১৮, ৩১
মৃত্যুঞ্জয় ৫১
যতীন্দ্র দত্ত ৫৫, ৫৯
যাত্রা নাটক ৩৫, ৪৩
যাদবপুর ৫৪, ৬৯
রথীন্দ্র দে ৬৩
রমেশ চন্দ্র দে ৩৮, ৪১, ৫৪
রাখাল শর্মা ৪৭
রাখাল মিস্ত্রী (দে) ৫০-৫১
রাজাপুর ২১
রাজেন্দ্র দে ৫৪

রায়মোহন ১৮
লঙ্গরখানা ৬১, ৬৫
লামডিং ৫৫, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৭৮-৭৯
শামসুল হক ২৪
শিবু ৩৮, ৬৬-৬৭
শিশুবালা দে ৩৮, ৪১
শিলচর ৬০, ৬১, ৬৯
শিশির ভট্টাচার্য্য ৩৫, ৪৪, ৫৮, ৭৩, ৭৭, ৭৯
শুভপুর ব্রিজ ৪৬
শ্রীনগর ৪৭, ৫২
শেখ মুজিবুর রহমান ১৫, ৮২
শৈলেন্দ্র দে ২৬, ৩২-৩৪, ৫৪
শ্রীশ অধিকারী ৪১
সতীন্দ্র বিশ্বাস ৫৪
সন্দ্বীপ ৬৩
সন্তোষ বরণ নাথ ১৯, ২৯, ৩৫, ৩৭, ৪১-৪৩, ৭৯-৮০
সারদা দে ৫৪
সাহাবাবু ৬৩
সীতাকুণ্ড ২৮, ৩১, ৩৩-৩৪, ৩৯, ৪১, ৪৬
সীতাকুণ্ড ওবায়দিয়া মাদ্রাসা ৪০
সুগার অব মিল্ক ২৭
সুধাংশু ঘোষ ৮২
সুনীল কুমার দাশ ২৯
সুবোধ চৌধুরী ২৩, ২৬, ৪১, ৪৫, ৬০
সুমন্ত দে ৫৪
সূত্রধর (ডাক্তার) ৭১
সুশীল দাশ ৭৮-৭৯
সুরেন্দ্র ঠাকুর ৪৭
সৃষ্টি ৩৭, ৬৪
হরিলাল দর্জি ২৫

হরিণা ৭৯-৮০
হরিহর চক্রবর্ত্তী ৫৩
হারেচ আহম্মদ ২১
হাজারী বাবু ৬৫
হাটহাজারী ২৭
হালখাতা ৫৩
হিমাংশু চক্রবর্ত্তী ৬৮-৬৯, ৭১-৭২, ৮০
হিমাংশু শীল ৭৩
হিরণ্ময় চক্রবর্ত্তী ১৯, ২৩, ৩২, ৩৪-৩৫, ৪০-৪৩, ৫১-৫২, ৫৪-৫৫, ৫৮-৫৯, ৬৬, ৭৫, ৭৯, ৮১
হীরেন্দ্র দে ১৯, ২৩, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৭-৩৯, ৪১, ৪৪-৪৫, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৯-৮০
হেরম্ব বিশ্বাস ৬১
হোজাই ৬৪, ৭১, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০-৮১
হোমিও সেবাসদন ৬৮, ৭২, ৮০

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি

তিথি : শ্রাবণ শুক্লা একাদশী ১৩৭৮ বাংলা
ঝুলনযাত্রা আরম্ভ

২য় অনুলিপি
হরিণা বাজার, ১৮/১২/৭১
২রা পৌষ ৭৮ বাংলা
২৯শে শাওয়াল, ৯১ হিজরি
শনিবার দুপুর ১টা।
তিথি পৌষ শুক্লা প্রতিপদ

জয় বাংলা

কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
হোমিও ডাক্তার
ডাকঘরঃ কুমিরা
জিলাঃ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।